আত্মকথা

সূচি

কেন পড়ি ? ৬৮৫
সাক্ষাৎকার (এক) ৬৮৭
সাক্ষাৎকার (দুই) ৬৯৪
সাক্ষাৎকার (তিন) ৭০৫
সাক্ষাৎকার (চার) ৭১৫

কেন পড়ি

"আমি যত পড় য়াকে জানি তাঁদের মধ্যে এমন ব্যক্তি কমই আছেন যাঁর পড়ার নেশা জন্মগত প্রবণতার অংশ বলে বিবেচিত হতে পারে। বেশির ভাগ ব্যক্তিই এই অভ্যাস দীর্ঘকাল ধরে সচেতন শ্রম ও চেষ্টার দ্বারা আয়ত্ত করেন। পরিবেশ ও সুযোগ কাউকে সাহায্য করে, কাউকে করে না। আমারও শৈশবে পড়তে আদৌ ভাল লাগত না। কিন্তু ভাল লাগাতে হবে এই সঙ্কল্প মনের মধ্যে ছিল। প্রথম বয়সে বড়াই করার উদ্দেশ্য নিয়েই বইপড়ার কঠিন শ্রমে আত্মনিয়োগ করি এবং একটা করে বই শেষ করেছি আর সদর্পে সেকথা জাহির করে বেড়িয়েছি। ক্রমে পাঠ-শ্রম স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত হয় এবং সৎ-গ্রন্থ পাঠে যে বিশিষ্ট আনন্দ তা আস্বাদন করার ক্ষমতা অর্জন করি। এখন জানি যে এ আনন্দ অক্ষয় এবং অনন্ত। এখন প্রতিদিনের বরাদ্দ আহার্য গ্রহণের মতোই নিয়মিত মূল্যবান কিছু পাঠ করতে না পারলে মন একপ্রকার অনুশোচনা ও অস্বস্তিতে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। কেবলই মনে হয় যেন সময় বয়ে গেল অথচ আমি এগিয়ে যেতে পারলাম না। তখন আমার গৃহকর্মের আনন্দও নষ্ট হয়। ক্ষতিপূরণের জন্য দৃঢ়তর সঙ্কল্প নিয়ে, দীর্ঘতর সময়ের জন্য, বহুতর বইপড়ার আয়োজনে মেতে উঠি।

যত ধনী পরিবারই হোক, চৌদ্দ বছরের ছেলেকে সাতাশ খণ্ড এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা উপহার দেওয়ার কথা বড় একটা শোনা যায় না। আর যখনকার কথা বলা হচ্ছে, তখন মুসলিম পরিবারে লেখাপড়া ব্যাপকভাবে শুরু হয়নি; যে কয়েকটি পরিবারে ছিল, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থাও লেখাপড়ার বৃহত্তর পরিবেশের মধ্যে প্রবেশের অনুমতি দেয়নি। অথচ যাদের অর্থ ছিল, তারা লেখাপড়ার প্রতি ছিল আগ্রহহীন এবং স্বভাবতই সাতাশ খণ্ড এনসাইক্লোপিডিয়া কেনার মতো মানসিকতা তাদের জন্মাবে না।

মুনীর চৌধুরী সাহেবের বাবা জনাব আবদুল হালিম চৌধুরী ব্রিটিশ আমলে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ছিলেন। কিন্তু তাই বলে এক ছেলেকে এনসাইক্লোপিডিয়া দেবার মতো অর্থ প্রাচুর্য তার ছিল না। মুনীর চৌধুরী সাহেব বলেন :

> বাবা শত অসুবিধা সত্ত্বেও আমাদের লেখাপড়ার দিকে সর্বপ্রকার যত্ন নিতেন। সরকারী কাজে অন্য জায়গায় থাকতে হয়েছে তাঁকে বহুবার এবং বাইরে থেকে তিনি যখনই মাকে লিখতেন, আমাদের লেখাপড়ার কথা তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী জোর দিয়ে উল্লেখ করা থাকতো।

অর্থাৎ মুনীর চৌধুরী সাহেবের প্রথম শ্রেণীর পাঠক হওয়ার পিছনে তাঁর বাবার অনুপ্রেরণাই সর্বাধিক। বাড়িতে ইংরেজি, উর্দু, আরবি বই মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত ; সমস্ত ভাইবোনের যখন যে বই খুশি, টান দিয়ে পড়ার অবাধ সুযোগ ও অধিকার ছিল। হালিম চৌধুরী সাহেব বলতেন :

> তোমাদের জন্যে আমার আর কিছুই দিয়ে যাবার ক্ষমতা নেই, এই বইগুলো ছাড়া। যদি পৃথিবীতে মানুষের মতো বেঁচে থাকতে চাও, তাহলে পড়ো।

বাবার এই অনুপ্রেরণা ছাড়া মুনীর চৌধুরী সাহেব আর একটি কারণে পড়াশোনায় আগ্রহী হয়েছিলেন। সেটি হচ্ছে :

> স্কুলের হিন্দু ছেলেদের সঙ্গে লেখাপড়ায় পারতাম না। ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ছিলাম না। কিন্তু তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে হলে বাইরের বই পড়া একমাত্র শ্রেষ্ঠ অবলম্বন বলে আমি মনে করতাম। হাতে সব সময় বই থাকত, যখনই সময় পেতাম পড়ে ফেলতাম। সব সময় হাতে বই থাকার জন্যে স্কুলে আমি চালিয়াত নামে পরিচিত হয়েছিলাম। হিন্দু বন্ধুরা বলত,
>
> মুনীর তুই সত্যিই পড়িস, না লোক দেখাস ?
>
> এই বইটার কোন্ চ্যাপ্টারে কী আছে, ধর আমাকে, বলে দেব।
>
> আসলে আমি স্থির করেছিলাম, চালিয়াতি যদি করতেই হয়, বই পড়েই করব।

পারিবারিক ঐতিহ্যের জন্যে অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী পাঠক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। বাসায় গেলে দেখতে পাওয়া যাবে, ড্রইং রুমের অধিকাংশ জায়গায় দখল করে আছে বইয়ের শেলফ, তাতে দেশী-বিদেশী বইয়ের সমারোহ। শুধু তাই নয়, তাঁব ভেতরের ঘরেও বই ও বিভিন্ন পত্রপত্রিকা।

সবকিছুই তাঁর পড়া চাই। আধুনিক জীবন ও জগতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে গেলে পড়াশোনা যে অপরিহার্য, সেটা তিনি বুঝেছিলেন আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াব সময়।

আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়টি এমন, যার সঙ্গে শহরের যোগাযোগ ছিল না। শহবে যেতে হলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হতো। শহবে এমন কিছু আকর্ষণ ছিল না, যাতে প্রত্যেক দিন যাওয়ার জন্যে মন টানে। তাই বাধ্য হয়ে পড়াশোনাতেই দিন কাটানো ছাড়া উপায় ছিল না।

'আমি তখন কম হলেও আট ঘণ্টা পড়াশোনা কবতাম। দুপুরে ক্লাস শেষে খেয়ে ইজি চেয়ারে শুয়ে পড়তাম। আসলে তখনই থেকেই আমার পড়ার অভ্যেসটা গড়ে উঠেছে।'

মুনীর চৌধুরী সাহেব এখন নানাবিধ কাজে কর্মে ব্যস্ত থাকেন বলে, আগেব মতো পড়াশোনায় সময় কাটাতে পারেন না। দুপুরে বাসায় ফিরে, কিছুটা বিশ্রাম করে তিনি পড়তে বসেন। রাত বারোটা সাড়েবারোটার আগে ঘুমোন না। আর লিখতে শুরু করলে, রাত দুটো তিনটে এমনকি সারা রাতও তিনি জেগে থাকেন। পড়াশোনার দৈনন্দিন নিয়মের ব্যাঘাত হয় বলে, তিনি বলেছেন :

> আমাকে যেন বিকেলে অথবা সন্ধ্যায় কোনো অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো না হয়। আমার পড়ার সময় অনুষ্ঠানগুলো পড়ে বলে, আমার যথেষ্ট ক্ষতি হয়।

আগেই উল্লেখ করেছি, পারিবারিক ঐতিহ্যই মুনীর চৌধুরী সাহেবকে পাঠক হতে সাহায্য করেছে। বাবা স্কলার, বড়ভাই অধ্যাপক কবীর চৌধুরী স্কলার। সেজন্য তাঁর পক্ষে পনব বছর বয়সেই শেকসপিয়ার, শ, ডিকেন্স, হুগো পড়া শেষ হয়েছিলো। পরবর্তীকালে নাট্যকার হওয়ার বাসনা তাঁকে অধিকতর নাটক পাঠে উৎসাহিত করল। তিনি স্বীকার করেন,

> আমার পাঠ-সীমার মধ্যে নাটকই বেশী।

সাক্ষাৎকার (এক)

মুনীর চৌধুরী সমকালের সাহিত্য, শিল্পকলা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি সদাশ্রুত নাম। আমাদের পরিচিত পরিমণ্ডলের অঙ্গন জুড়ে তাঁর স্থান। মুনীর চৌধুরী সম্পর্কে ভাবপ্রবণ হয়ে ওঠা সহজ এবং তা আমরা হয়েছিও, কখনও অতিরিক্ত স্তুতিবাদে, কখনও অহেতুক নিন্দায়। তার প্রধান কারণ, আমরা রয়েছি তাঁর অতি কাছাকাছি। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব সমকালের উপর এত অসামান্য যে, এখনও তিনি আমাদের রক্তে আলোড়ন সৃষ্টি করেন, কল্পনায় রোমাঞ্চ এনে দেন।

তিনি শিল্পী, তিনি সাহিত্যিক, আবার তিনি পণ্ডিত, তিনি অধ্যাপক। আমাদের এই 'গ্রেট মাইনর' বা খণ্ড প্রতিভার যুগে তিনি অবশ্যই একজন প্রতিভাধর।

অধ্যাপক মুনীর গভীর আন্তরিকতায় উদ্বুদ্ধ। মহৎ মানবিক বেদনায় পরিমার্জিত তার শিল্পীকণ্ঠ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি যখন প্রতিবাদ কবেন তখনও নিজে তিনি বেদনায় আপ্লুত, তখনও তাঁর হৃদয় রক্তাক্ত। তিনি বিদ্রোহী কিন্তু তাঁর ঘৃণা ও ক্রোধ অসীম করুণায় পরিমার্জিত, পরিশুদ্ধ ও ধৌত। এমন কি অনেক সময় হৃদয়াবেগের প্রাবল্যে তা আপোষধর্মী !

নাট্যকার মুনীর চৌধুরীর বিচিত্র জীবনী বিভিন্ন অঙ্কে বিভক্ত একখানা নাটক। তাঁর জীবন-নাট্যের কত না বিচিত্রি বর্ণলীলা, কত সুদূর প্রসারী কল্পনা ও কর্মের উন্মাদনা। আবার ওতেই আশ্চর্যরকমভাবে মিশেছে কতনা ভাল-মন্দ, সংস্কার ও আবেগের প্রেরণা। তাঁর অত্যন্ত সংবেদনশীল এক বিরাট হৃদয় রয়েছে ; কিন্তু সেই বিরাট হৃদয়ের আড়ালে তাঁর যুক্তিনির্ভর যে মনটি রয়েছে তা অক্লান্তভাবে বৈচিত্র্যের সন্ধানী। তাই তিনি হয়েছেন সম্পূর্ণরূপে পরিবেশের দাস— চারিদিকের আবেষ্টনীর শিকার। তার এই বৈচিত্র্য-পিয়াসী মনের সাথে যুক্ত হয়েছে জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করার ঐকান্তিক অভিলাষ। নিজেকে নিয়ে সুখী থাকার একটা প্রবণতা তাঁর সকল কর্মের আড়ালে।

তিনি বিচিত্রভাবে বাঁচতে জানেন। জীবনের একাধিক বিষয়ে তিনি উৎসাহী ও পারদর্শী। তিনি ভাল ছবি আঁকেন, শিকার করেন, ভাল অভিনয় করেন। ঝোলা হাতে তাঁকে বাজার করতে দেখা যায়, তাঁর মোটরের পিছনে মাছ ধরার সরঞ্জাম সব সময় মজুত। মজার কথা, তিনি বাঁশি ও বেহালা বাজাতে পারেন।

অন্তরঙ্গ আলোকে তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনার সাথে পরিচিত হতে আমার তিনটা বৈঠকী দিতে হয়েছে। তাও কি শুধু ঘরে বসে ! কখনও মোটরে, কখনও ফোনে। একঠায় বসে থাকা তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ।

জীবনকথার শুরুতেই তিনি বলেন, "প্রবল প্রাচুর্য আর গভীর আন্তরিকতার মধ্যে আমি লালিত। ১৯২৫ সালের ২৭শে নভেম্বর আমার জন্ম। সেদিন ছিল শুক্রবার। আমাদের

বাড়ি নোয়াখালী। মামার বাড়ি কুমিল্লা অথচ আমি জন্ম নিলাম মুন্সীগঞ্জে। বাবা জনাব আবদুল হালিম চৌধুরী তখন সেখানে এসডিও।

"আমার জ্ঞানের উন্মেষ ঘটে বগুড়ায়। সেখানকার সব স্মৃতি আমার কাছে ঝাপসা-অস্পষ্ট। যখন আমি সব কিছু বুঝতে শিখলাম তখন আমরা পিরোজপুরে। বিদ্যা ও বিত্তে একটি সম্ভ্রান্তশালী পরিবারে আমি মানুষ। সমাজে কেতাদুরস্তভাবে বাঁচতে হলে তার জন্য যেসব কায়দা রপ্ত করতে হয় তা ছিল আমাদের পবিবারের মজ্জাগত। বাবা ছিলেন ইংরেজি ও আরবিতে পণ্ডিত। মনে আছে 'রওয়ানে গুল' তেল, 'পিয়ারসন' সাবান আর কিউটি করা পাউডার সে সময় আমাদের বাড়িতে গড়াগড়ি দিত। খাওয়া আর পড়ার প্রবল প্রাচুর্য ছিল আমাদের পরিবারে। রাশিরাশি বই আর খাবারে মধ্যে ডুবে থাকতাম।

"আমাদের নাস্তার জন্য কলকাতা থেকে রুটি আব পলমলের মাখনের টিন আসতো। ম্যাট্রিক থেকে এমএ ক্লাস পর্যন্ত আমার নাস্তা ছিল কমপক্ষে ১২ স্লাইজ প্রচুব মাখন দেয়া রুটি, ৩টা ডিম, কিছু মিষ্টি, একবাটি দুধ আর পরে দু'কাপ চা। এখন কর্মজীবনে ২/৩ স্লাইজ রুটি। যেদিন মাখন দেয়া থাকবে, সেদিন ডিম নেই। বলছি না, এর বেশি খাবাব সামর্থ্য নেই, সমাজ অবস্থার বিবর্তনের কথা বলছি। ছোটবেলায় খাওয়াব ব্যাপারে কোন 'না' ছিল না। তবে বিলাসিতা পেস্ট্রি, কেক্–এসব আমাদেব বাসায় উঠত না। আমাদের বড় হওয়ারও অনেক পরে পর্যন্ত আমাদের বাসায় ড্রইং রুম ছিল না।

পড়াশোনার ব্যাপারে বাবা ছিলেন অত্যন্ত কড়া। আমবা ১৪ ভাই বোন। বাবা সবাইকে বাড়িতে নিজে পড়াতেন। বিশেষ ইংরেজি আর আরবি। ছেলেপেলেদের পড়ানোর প্রতি তার একটা ঝোঁক আগাগোড়া দেখেছি। এখন একটা কথা বাবা প্রায় সাবধান করে দেন, 'কোনো ইংরেজি বা বাংলা পাঠ্যপুস্তক আমি সংশোধন না করে দিলে পড়া শুরু করবি না।' বাবার শাসনের বেড়াজালে আমি মানুষ। বাবার হাতে বহুবার বেত খেয়েছি।

দেয়ালভর্তি বইয়ের মধ্যে আমার জন্ম। আমার বয়স যখন ১৪ বছর, তখন বাবা সাতাশ খণ্ড এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা উপহার দিয়েছেন। মার প্রতি বাবার ঢালাই নির্দেশ ছিল, বই কেনার জন্য যখন পয়সা চাইবে দেবে। তিনি আমাদের ছোটবেলাতেই শিখিয়ে দিয়েছিলেন, সম্মান অর্জনের উপায় একমাত্র জ্ঞানার্জনেব পথে। তিনি বলতেন, 'তোমাদের জন্যে আমার আর কিছুই দিয়ে যাবার ক্ষমতা নেই, এই বইগুলো ছাড়া। যদি পৃথিবীতে মানুষের মতো বেঁচে থাকতে চাও, তা হলে পড়।' বাড়িতে ইংরেজি, উর্দু, আববি, বাংলা বই ছিল মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত।

১৯৩৫ সালে বাবা ঢাকায় বদলি হয়ে আসেন। আমি ভর্তি হই ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে। আমবা থাকতাম আর্মানিটোলায় জোবেদামহলে। স্কুলে আমি কোনো সময় ভাল ছাত্র ছিলাম না। ক্লাসের হিন্দু ছাত্রদের সাথে লেখাপড়ায় পারতাম না। কিন্তু তাদেব সাথে পাল্লা দিতে হলে বাইরের বই পড়া একমাত্র শ্রেষ্ঠ অবলম্বন বলে আমি মনে করতাম। সব সময় হাতে বই থাকতো বলে স্কুলে আমি 'চালিয়াত' নামে পরিচিত হয়েছিলাম। বন্ধুরা বলতো, 'মুনীর তুই সত্যিই পড়িস, না লোক দেখাস'? আমি বলতাম– 'এই বইটাব কোন্ ট্যাপ্টারে কী আছে, ধর আমাকে, বলে দেব।'

আসলে আমি স্থির করেছিলাম চালিয়াতি যদি করতেই হয়, বই পড়েই করব।

"১৯৪১ সালে আমি ম্যাট্রিক পাস করি। এরপর কী পড়ব ? বাবা চাইলেন আমি ডাক্তার হই। ঠিক হল. আইএসসি পড়া। গেলাম আলিগড়ে। প্রথম বাড়ির বাইরে গেলাম। আমার মধ্যে নিয়ম. না মানার একটা অবাধ্যতা ছোটবেলা থেকে ছিল। তাই ভাই-বোনদের মধ্যে আমি ছিলাম একটু বেয়াড়া। এবার বিহঙ্গ মুক্ত হোল।

আলীগড় আমায় মোহিত করতে পারে নি। তবে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের যা আমাকে আকর্ষিত করেছিল, তা হচ্ছে এর বিশাল পাঠাগার। বিশ্বের সকল লেখকের রচনার সাথে আমার ঘনিষ্ঠ যোগ হয় এই পাঠাগারে।

বিজ্ঞানের প্রতি আমার খুব ঝোঁক ছিল না। ক্লাসের পড়ার চাইতে বাইরের পড়াতেই আমার সময় কাটত বেশি। শেষ পর্যন্ত দু'পেপার পরীক্ষা সম্পূর্ণ রূপে না দিয়েই পালিয়ে এলাম।

বাড়িতে বাবা-মা শুনে ভীষণ রাগ করলেন। বড়ভাই কবীর চৌধুরীকে জানালাম, আমি আইএ পড়ব। আরেকটা সুযোগ আমায় দাও। বড়ভাই আমাকে গভীর অন্তরঙ্গতাব সাথে বিচার করলেন। আমার প্রতি তাঁর ছিল ভীষণ আস্থা। তিনি বাবাকে বোঝালেন। তাঁর প্রেরণার ফলেই আমার মধ্যে আত্ম-প্রত্যয়ের সঞ্চার হয়। বাবা তখন বরিশালে। আমি সেখানে কলেজে ভর্তি হওয়ার কথা ভাবছি। একদিন হাঁটছি। পথে আমার বন্ধু গওছল আনম খাঁর সাথে দেখা। সে বলল, 'মুনীর তুই রেজাল্ট জানিস' ? সম্পূর্ণ পরীক্ষা দেইনি, তাই রেজাল্টের খোঁজ করিনি। সে বলল, 'তুই সেকেন্ড ক্লাস পেয়েছিস'। আমি তো আকাশ থেকে পড়েছি। ছুটলাম ক'বার কাছে। ট্রাঙ্কল করলাম। পরে জানলাম ঠিকই। মার্কশিট নিয়ে দেখলাম কোনো কোনো বিষয়ে এত বেশি পেয়েছি যে ও দুটো বিষয় ভালভাবে দিলে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে যেতাম।

এরপর ভর্তি হলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইংরাজিতে অনার্স। আলিগড় থেকে সৌখিনতার যে কটা দিক ছিল ষোলআনা শিখে এসেছিলাম। হাতে সিগারেটের টিন, পায়ে নাগরা, ধবধবে আচকান, পাঞ্জাবিতে সোনার বোতাম–যেন একটা সাক্ষাৎ বাদশাহজাদা। বিশ্ববিদ্যালয়ে রীতিমতো দর্শনীয় বস্তু হয়ে উঠলাম। আড্ডা দেওয়াব অভ্যাসটা আমি রীতিমতো রপ্ত করে এসেছিলাম। কিন্তু ক'দিন পরেই দেখলাম সে সব বেসামাল। একটা প্রথম অতৃপ্তি-পূর্ণাঙ্গতার অভাব তখন আমার কাঁচা মনে।"

মুনীর চৌধুরী তখন এক সংবেদনশীল ও হৃদয়বান তরুণ। অতৃপ্ত মুনীর এর আগেই ওয়াগনার ও টলস্টয়ের শিক্ষা— ইতালি ও জার্মানির মানবতাবাদের সাথে পরিচিত হয়েছেন। সেক্সপিয়ার, 'শ, ডিকেন্স, হুগো তখন তাঁর পড়া শেষ। এমন সময় তিনি এলেন একদল তরুণের সংস্পর্শে। শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্নে যারা বিভোর, মুক্তির সংগ্রামে যারা অকুণ্ঠ। তাঁর ভাষায়—

> সেই প্রতিভাদীপ্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছেলেগুলি আমায় আকর্ষণ করল। তাদের নিষ্ঠা, মেধা, আর প্রজ্ঞা আমায় মুগ্ধ করল। সেই রবি গুহ, দেবপ্রসাদ, মদন বসাক, সরদার ফজলুল করিম, প্রত্যেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক একটি উজ্জ্বল রত্ন। তাদের সংস্পর্শে এসে দেখলাম আমার এতদিনের আভিজাত্য, চাকচিকাময় সৌখিনতা আব

চালিয়তি দম্ভ সব অন্তঃসারশূন্য, সব ফাঁকি। সে সময় পড়ুয়া ছাত্র হিসেবে আমার নাম হয়েছে। এদের চোখে জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করলাম।

কোনো সুলভ আপ্তবাক্য আর এই সংবেদনশীল ও হৃদয়বান তরুণকে সন্তুষ্ট রাখতে পারল না। মানবতার জন্য সংগ্রামের যখন ডাক এল, তখন সাড়া দিতে তার খুব বেশি বিলম্ব ঘটল না। ইতিমধ্যে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছতর এবং সহানুভূতি আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। সাহিত্যের পূর্বেকার ঝোঁক এবার তাঁকে রীতিমতো লিখিয়ে করে তুলেছে। এমন কি শিল্পকর্মে সৌখিনতার প্রলোভন তিনি অতিক্রম করেছেন। যে সুপ্ত অন্তর্দ্বন্দ্ব তাঁকে এতকাল ধরে পীড়িত করেছে, তাকে তিনি জয় করলেন। 'শিল্পীর জ্ঞান-বিজ্ঞানও নয়, বোধিও নয়— এ জ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে আবেগময় অভিজ্ঞতা।' ধীরে ধীরে বহুবৎসর ধরে জীবন-জিজ্ঞাসার রহস্য তাঁর কাছে উন্মোচিত হয়েছে, হঠাৎ আলোর ঝলকানির আশায় উর্ধ্বমুখে বসে থাকেন নি তিনি, অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই দুঃখের স্বরূপ চিনেছেন। চরম বামপন্থী আন্দোলনের সাথে তিনি জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর বক্তৃতা ছিল অনলবর্ষী এবং মার্জিত রুচিসম্পন্ন। তখন এ দেশে মুক্তি আন্দোলনের জোয়ার। যুগের সন্তান মুনীর একজন নিষ্ঠাবান মুক্তিসেনা ছিলেন। তাঁর ভাষায়—

> লিখব এ চেতনাটা দানা বাঁধল। এ সময়ে রাজনীতি জীবনকে নূতন অর্থ দিল। আমার চরিত্র গঠনে এর দান অপরিসীম। সে সময়টাও ছিল জাতীয় জীবনের সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্ত। আমার মতো সমাজ-সচেতন ছেলে তা আন্দোলিত না করে পারে নি। পড়াশুনা, বিতর্ক, আন্দোলন, সভা-সমাবেশ নিয়ে জীবনটা তখন অত্যন্ত কর্মমুখর। বিশেষ করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়কার সে দিনগুলোতে আমরা ছিলাম জাগ্রত প্রহরী। মনে আছে একদিন–রাত তখন একটা। শুনলাম এক ভদ্রলোক আটকা পড়েছেন বক্সীবাজারে। মাত্র দুজন সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে ছুটলাম তাঁকে উদ্ধার করতে। দেখলাম গুণ্ডারা অবরোধ করে আছে বাড়ি। তাবই মধ্যে মোটরে করে নিয়ে ফিরলাম তাঁকে। সে কী রোমাঞ্চ, সে কী উত্তেজনা। আমাব 'মানুষ' নাটকখানিতে এ জীবনের ছবিই এঁকেছি।

মুনীর চৌধুরী রাজনৈতিক মতাদর্শে দীক্ষিত হয়ে ঠিক করলেন ল' পড়বেন। কিন্তু পরিবেশের দাস মুনীর চৌধুরীর রাজনীতির প্রতি একনিষ্ঠ শ্রদ্ধা টিকল না। বৈচিত্র্যের সন্ধানী তিনি। বুঝলেন, যে রাজনীতিতে তিনি পা দিয়েছেন, তা চালিয়ে যাওয়া তাঁর মতো চঞ্চলচিত্ত তরুণের পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর মধ্যবিত্ত মানসিকতার জন্যই বামপন্থী বাজনীতি ছাড়লেন। তিনি বলেন :

> এ রাজনীতির প্রতি আমার অশ্রদ্ধা নেই। এর দীর্ঘসূত্রিতা আমার দ্বারা সম্ভব ছিল না। সম্পূর্ণ রূপে জীবনকে চিনিয়ে দিতে পারলে আমি ধন্য হতাম, কিন্তু সে ত্যাগের ক্ষমতার অভাব ছিল আমার মধ্যে। তাই রাজনীতি ছেড়ে দিলাম একেবারে।

ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কে তিনি বলেন :

> আমি ছাত্র দলাদলির চূড়ান্ত পর্যায়ে অংশ নিয়েছিলাম। হাতাহাতি পর্যন্ত করেছি, কিন্তু আমাদের সময় কখনও খুনাখুনি হয়নি। আমায় ছাত্ররা নাস্তিক বলত–বলত সাম্যবাদী। কথায় কথায় হুঙ্কার উঠত 'বাত্তি নেবাও'। বহু মার খেয়েছি— মাব

দিয়েছি, কিন্তু মারামারি খুনোখুনি পর্যন্ত পৌঁছায়নি। তাছাড়া আমরা বা আমাদের বিপক্ষ দল দুটো কাজ কখনও করেনি। তা হচ্ছে কখনও পুলিশের আশ্রয় নিইনি আর কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিকার দাবি করিনি। আমার মনে হয়, প্রতিক্রিয়াশীল চক্র এখন ক্রমশ ক্ষয়ে আসছে, তাই তারা এত মারমুখী হয়ে উঠছে।

রাজনীতি থেকে সরে এসে মুনীর চৌধুরী পুরোপুরিভাবে সাহিত্য সেবায় মনোযোগ দিলেন। তবে, সাহিত্য সাধনায় নিজেকে ব্যবসায়ীর হাটে নামিয়ে আনেন নি। শিল্পকে অবসর বিনোদনের পণ্য করবার কথা তিনি ভাবতেও পারেন না। সে সময় তিনি ইংরেজিতে এমএ পাস করলেন (১৯৪৮)। চাকরি নিলেন দৌলতপুর কলেজে। বিয়ে করলেন। লিলি মীর্জার সাথে তার পরিচয়, প্রণয় ও প্রেম অল্প দিনের নয়। তাকে বিয়ে করে সংসারি হওয়ার চিন্তা তখন তাঁর সম্পূর্ণ চেতনা জুড়ে। '৪৯ সনের মার্চ মাসে তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। তখন প্রদেশব্যাপী বেল ধর্মঘট। তিনি রাজনীতি ছাড়লেও কর্তৃপক্ষ তাঁকে ছাড়লেন না। ছাড়া পেয়ে আবার সে কলেজে গেলেন। তখন ঢাকায় ঢোকা তাঁর প্রতি একপ্রকার নিষেধ ছিল। '৫০ সালে জগন্নাথ কলেজ কর্তৃপক্ষ বিশেষ অনুমতি নিয়ে ঢাকায় আনলেন ইংরেজির অধ্যাপক করে। সেই বৎসরই আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হলাম। এরপর দু'বছর নিরবচ্ছিন্ন অধ্যাপক জীবন। '৫২ সনের মহান ভাষা আন্দোলনের সময় আমায় আবার কারাগারে নিক্ষিপ্ত করা হোল। এ আন্দোলনের সাথে আমি সক্রিয়ভাবে আদৌ জড়িত ছিলাম না। শুধু গুলির খবর শুনে আমি পাগলের মতো রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিলাম। প্রায় আড়াই বছর কারাগারে থাকলাম। কারাগারের শ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে– আমার বাংলায় এমএ ডিগ্রি, 'কবর' নাটক, 'শ'-এর অনুবাদ। কেউ কিছু বলতে পারে না, গলসওর্দীর অনুবাদ– রুপার কৌটা।

'কবর' রচনার কাহিনী মনে আছে। রণেশ দা'রা বললেন, একুশে ফেব্রুয়ারিতে অভিনয় করা যায় এ ধরনের নাটক লিখবে। মনে রাখবে, রাত ১০টার পর জেলার বাতি নিভিয়ে দেবে। লণ্ঠনের আলোতে যেন নাটকটি করা চলে আর মেয়ে চরিত্র এমনভাবে থাকে, যেন পুরুষদের দ্বারা তা অভিনয় করা চলে। কবরের পাঠক জানেন 'কবর' নাটকে আমি তাদের দাবি পূরণ করেছি।

বাংলায় এমএ পরীক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে কারাগারে অজিত গুহ আমায় বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন। মনে আছে ভাইভা পরীক্ষার দিনের কথা। আই-বি-আর পুলিশ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকলাম। মধুতে সবাই আমায় ঘিরে বসল। তাদের কত জিজ্ঞাসা, কত আলাপ। হঠাৎ দূর থেকে আমার বোন আমায় দেখতে পেয়ে ছুটে এল। জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল ও। ইংরেজি ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীরা এসে কুশল জিজ্ঞাসা করল। যখন ভাইভা দিতে 'হেড'-এর ঘরে ঢুকলাম দেখি সব কয়েকজন পরীক্ষক খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। সে কী আবেগাপ্লুত মুহূর্ত ! ড. এনামুল হককে ডক্টর শহিদুল্লাহ বললেন, ওনাকে কী আর প্রশ্ন করব ? রেজাল্টটা জানিয়ে দিই। তখন রেজাল্ট ভাইভার আগেই ঠিক হয়ে থাকত। তারা আমায় জানালেন– ভাল করেছি। এ আমার জীবনের প্রথম পরীক্ষায় সর্বোচ্চ কৃতিত্ব।

"আমি প্রথম বিভাগে প্রথম হয়েছিলাম।"

"জেল থেকে ছাড়া পেলাম '৫৪ সনে। তার পর কিছুদিন ইংরেজিতে ফুলটাইম আর বাংলায় পার্টটাইম অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেছি। পরে বাংলায় পুরোপুরি অধ্যাপক হয়ে গেলাম। এ ব্যাপারে অধ্যাপক মুহম্মদ হাইয়ের সাহায্য আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। সমকালে আরেকজনের ব্যক্তিত্বের প্রভাব আমার উপর রয়েছে। তিনি আমার সংশোধক ও পরীক্ষক এবং গবেষক ডক্টর এনামুল হক।

"১৯৫৬ সালে আমি ভাষাতত্ত্বে এমএ. পড়ার জন্য হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যায়ে গেলাম স্ত্রী-পুত্রসহ এক বিশেষ বৃত্তি নিয়ে। সেখানে পড়াশুনা ছাড়াও বিদেশ ভ্রমণের যে আনন্দ তা আমি উপভোগ করেছি। বিশেষ করে আমার প্রিয় নাটক দেখার সুযোগ আমি ছাড়তাম না। বোস্টন ছিল নাটকের প্রাণকেন্দ্র। সেখানে বিশ্বের বিভিন্ন নাটক ও অভিনেতার সৃষ্টির সাথে পরিচিত হওয়া অবকাশ ঘটল আমার। '৫৮ সালে ভাষাতত্ত্বে এমএ পাস করে স্বদেশে ফিরলাম।"

তিন বিষয়ে এমএ. পাস করে অধ্যাপক মুনীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের জীবনযাপন শুরু করলেন। ১৯৬৩ সালে তিনি রিডার হলেন। এতদিন তিনি সাহিত্য পড়াতেন। বিশেষ করে নাটক। ইদানীং ভাষাতত্ত্ব পড়ানোর ব্যাপারে তিনি সবচেয়ে আগ্রহী। সাহিত্য পড়াতে পড়াতে একঘেয়ে হয়ে গেছে তার কাছে। তিনি বলেন— I do not want to repeat myself, ছোটবেলা থেকে তিনি সাহিত্যচর্চা করতেন। ১৯৪২ সালে তাঁর প্রথম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপপূর্ণ রচনা 'আসুন চুরি করি' ছাপানো হয়। তবে ১৯৪৬ থেকে ৪৮ সন পর্যন্ত রাজনীতিতে দীক্ষার সময় তাঁর সাহিত্য প্রকৃত জীবনদৃষ্টি খুঁজে পায়। তিনি শিখেন জীবনের বহু বিচিত্র নিরন্তর ধারাকে বুঝতে না পারলে শিল্পী আর শিল্পী থাকে না, তার অপমৃত্যু ঘটে। রাজনীতি ছাড়লেও সাহিত্যের জীবনদৃষ্টি তিনি এখনও হারান নি। সাহিত্যিক জীবনে তাঁকে যাঁরা প্রেরণা যুগিয়েছেন, তন্মধ্যে রণেশ দাশগুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও গোপাল হালদার প্রধান।

মুনীর প্রতিভার অবিসংবাদিত নিদর্শন হোল তাঁর নাটক। হয়ত অনেকের মতো তাঁর নাটকে কাহিনী দুর্বল, ঘটনার সংঘাত নেই। অভিযোগ গ্রাহ্য হলেও সম্পূর্ণ সত্য নয়। সমস্যামূলক চিন্তাশ্রয়ী নাটক রচনায় তিনি সমকালীন সব নাট্যকারকে অতিক্রম করেছেন। তাঁর এক বৃহৎ উদ্ভাবনী ক্ষমতা এবং তীক্ষ্ণ সমাজ-সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। তিনি যেসব কাহিনী সৃষ্টি করেছেন, শ'-এর ভাবশিষ্য বলে হয়তো, কখনও তা অদ্ভুত, অবাস্তব ও অত্যন্ত সাময়িক কোনো সমস্যার সাথে জড়িত তবুও তাঁর রচনায় ধনতান্ত্রিক সভ্যতার বিরোধ, অসঙ্গতি, প্রতারণা ও আদর্শপ্রীতি ছলনার বিরুদ্ধে পরোক্ষ ও অন্তঃসলীলা আঘাত আছে। অনন্যসাধারণ হচ্ছে তাঁর সত্যভাষণের পদ্ধতি, তাঁর চতুর হাস্যরসামৃত বাচনভঙ্গি ও নানা বিপরীত কথন, এ প্রোগ্রামের মাধ্যমে অভ্যস্ত চিন্তা আর সংস্কারের জড়ত্বকে আঘাত করার কৌশল। তাঁর অপূর্ব বাক্যবিন্যাস, বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঙ্গ এবং অতিশয়োক্তি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে আনন্দ দিয়েছে। তাঁর নাটকের মধ্যে কবর, চিঠি, রক্তাক্ত প্রান্তর, দণ্ডকারণ্য, রুপার কৌটা, কেউ কিছু বলতে পারে না প্রধান।

তাঁর সাহিত্য জগতে প্রবেশ ছোটগল্পকার হিসেবেই। মানুষের জন্য, খড়ম, ন্যাংটার দেশ, একটি তালাকের কাহিনী তাঁর বিখ্যাত গল্প। তার 'গ্ন পা' গল্প উর্দু ভাষায় অনূদিত হলে সুধীমহলে প্রশংসিত হয়।

গবেষণাতেও তিনি নিজেকে আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁর 'মীর মানস' মীর মোশাররফ হোসেনের সাহিত্যকর্মের উপর রচিত একখানি সারগর্ভ সমালোচনা।

সাহিত্য-গবেষণার জন্য তিনি দাউদ পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর 'তুলনামূলক সমালোচনা' বাংলাসাহিত্যের একখানি মূল্যবান সংযোজন হবে। সমগ্র ইউরোপীয় সাহিত্যের নিরিখে তিনি বাংলা সাহিত্যকে পরীক্ষা ও বিচার করেছেন এ গ্রন্থে। তিনি সাহিত্যে বিশ্বনাগরিকতায় বিশ্বাসী। তাই সমকালীন তরুণ লেখকরা তাঁর প্রিয়পাত্র। অত্যাধুনিক সাহিত্যরীতি সম্পর্কে তিনি বলেন "অত্যাধুনিক পূর্বপাকিস্তানি গদ্য লেখকরা পূর্ববর্তী লেখকদের চোখে অনেক বেশি বিশ্বনাগরিকতা প্রাপ্ত ও স্বাতন্ত্র্যাভিলাষী। চতুঃপার্শ্বে দেশভক্তির নামে গ্রাম্যতা, ধার্মিকতার নামে কূপমণ্ডুকতা এবং নীতিপরায়ণতার নামে অমানবিকতার প্রতাপ প্রত্যক্ষ করে এরা কুপিত। এরা সাহিত্যে সর্বপ্রকার মধ্যযুগীয়তা বিরোধী, লোকসংস্কৃতির স্থূল সরলতার পরিপন্থী।"

অধ্যাপক মুনীর জীবনে পরিপূর্ণ কিন্তু পরিতুষ্ট নন। তিনি প্রতিভাবান আর সে প্রতিভার স্বীকৃতি দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র তাঁকে দিয়েছে। এদিক থেকে তিনি ষোলকলায় পূর্ণ। কিন্তু কী একটা অভাববোধ— কী একটা না দিতে পারার বেদনা তাঁকে মাঝে মাঝে পীড়িত করে। জীবনকে উৎসর্গ করতে না পারার বেদনা তাঁর জীবনে গভীর। প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ আর প্রাচুর্যের মধ্যে এখন বাস করা সত্ত্বেও আমি শিল্পীর চোখে মুখে মর্মপীড়ার স্বাক্ষর দেখেছি।

অত্যন্ত উর্বর মাটিতে একটি বীজ বিশাল মহীরূহের সম্ভাবনা নিয়ে অংকুরিত হয়েছিল। অনুকূল আবহাওয়ায় লালিত হয়ে তা একদিন বৃক্ষে পরিণত ও ফুলফলে ভরে উঠেছে, কিন্তু সে বৃক্ষের পাতায় পাতায় গায় সবুজের প্রশান্তি কই ?

সাক্ষাৎকার (দুই)

নির্মলেন্দু গুণ : স্বাধীনোত্তর যুগে আপনার কাছে বাঙালি জাতীয় জীবনের কোন তারিখটিকে সবচাইতে প্রিয়, উল্লেখযোগ্য এবং সংগ্রামী প্রেরণায় সবচাইতে উদ্দীপনামূলক বলে মনে হয় ?

মুনীব চৌধুরী : (গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি উচ্চারণ করলেন) একুশে ফেব্রুয়ারি।

নির্মলেন্দু গুণ : ২১শে ফেব্রুয়ারি কি সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষার সংগ্রাম ছিল, না পুনরুদ্ধারের ?

মুনীর চৌধুরী : কেবল রক্ষা নয়, পুনরুদ্ধারেরও বটে।

নির্মলেন্দু গুণ : আপনি কি মনে করেন, এই সংগ্রাম শুধুমাত্র ভাষা এবং সংস্কৃতির প্রশ্নেই সীমাবদ্ধ ছিল, না রাজনৈতিক তথা বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তির প্রশ্নটিও এর সাথে জড়িত ছিল ?

মুনীব চৌধুবী : এ আন্দোলন প্রকৃত অবস্থায় এমন ছিল, বরং বলা চলে এমন এক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল, যা পরবর্তীকালে সংস্কৃতির প্রশ্নটিকে ভিত্তি করেই আমাদের রাজনৈতিক অধিকার তথা অর্থনৈতিক মুক্তির প্রশ্নটিই স্পষ্ট করে তুলেছিল। আর তাছাড়া রাজনৈতিক অধিকার, অর্থনৈতিক মুক্তি এবং সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা এ তিনটা প্রশ্ন এত বেশি একসঙ্গে মিশে যায় যে, কোনোটাকেই বিচ্ছিন্ন বা আলাদা কবে দেখাটা সম্ভব নয়, উচিতও নয়।

নির্মলেন্দু গুণ : কিন্তু এই ভাষা আন্দোলনে শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ থেকে কি আপনার কখনও মনে হয়েছে যে, এর পেছনে ভাষার চাইতে অর্থনৈতিক মুক্তির দাবিটিই বেশি সোচ্চার ?

মুনীর চৌধুরী একটু চিন্তা করলেন, কপালে, মুখে তাঁর ডান হাতের আঙুলগুলো এলোমেলো খেলা করল কিছুক্ষণ— তারপর খুবই দৃঢ়স্বরে তিনি বললেন, —হ্যাঁ। আমার সব সময়ই মনে হয়েছে ভাষাকে কেন্দ্র করে ১৯৫২-র ২১শে ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত মুহূর্ত পর্যন্ত আন্দোলনের এই যে বিস্তৃতি তার মধ্যে দরিদ্র-মধ্যবিত্ত ক্ষয়িষ্ণু পরিবারের ছেলেমেয়েদের অংশগ্রহণের এই যে উন্মাদনা, এর পেছনে অর্থনৈতিক অব্যবস্থা অনেকাংশে দায়ী। তিনি 'অনেকাংশে' শব্দটা পাল্টে নিয়ে পুনর্বার আরো জোর কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন— বলা চলে মূল কারণ। তিনি উল্লেখ করেন, এই ভাষা আন্দোলনে মূলত মধ্যবিত্তেব অংশগ্রহণ তাই নানা কারণে উল্লেখযোগ্য।

হুমায়ুন কবিব তাহলে, ভাষা আন্দোলনের অন্যতম কর্মসূচিতে অর্থনৈতিক মুক্তি প্রশ্নটিকেই আমবা পুরোধা ধরে নিতে পারি।

নির্মলেন্দু গুণ : আপনাকে কবে কোথায় গ্রেফতার করা হয় ?

মুনীর চৌধুরী : আমার তারিখটা মনে নেই— খুব সম্ভব ২৪শে ফেব্রুয়ারি ভোবে ২৭নং নীলক্ষেতের বাসা থেকে পুলিশ আমাকে গ্রেফতার করে।

হুমায়ুন কবির : এই কি আপনি প্রথম গ্রেফতার হলেন ?

মুনীর চৌধুরী : (হাসলেন তিনি, আমার মনে হলো এই মুহূর্তে তিনি অতীতেব অনেক কিছু ভাবছেন) না, ১৯৪৯ সালের ৩রা জুন আমি প্রথম গ্রেফতার হই।

নির্মলেন্দু গুণ : অপরাধ ?

মুনীর চৌধুরী : আমি তখন রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়নের সঙ্গে জড়িত ছিলাম। রেল শ্রমিকরা তখন তাদের দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য হরতালের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। হয়ত সে কারণেই আমাকে গ্রেফতার করা হয়।

রেলওয়ে শ্রমিক প্রসঙ্গে আমরা তাঁর কাছ থেকে সোমেন চন্দেব কথা শুনলাম– সোমেন চন্দও একসময় রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়নে জড়িত ছিলেন। তখন অবশ্য সোমেন চন্দ বেঁচে নেই। সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্টদের হাতে ঢাকাব এই তরুণ সাহিত্যকর্মী নিহত হন।

নির্মলেন্দু গুণ : আপনি এক সময়ে মার্কসবাদে বিশ্বাসী রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। কারাগারে বসে আপনি 'কবর' নাটিকা যখন রচনা করেন, তখন কি বাইবের আন্দোলনকে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ার দিকে প্রবাহিত করার কথা ভাবতেন ?

মুনীর চৌধুরী : প্রকৃতপক্ষে তখন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক ছিল না। ১৯৪৮-এর পর থেকেই আমার আত্মোপলব্ধি হয়েছিল যে, প্রত্যক্ষ বাজনীতি আমার ক্ষেত্র নয়।

নির্মলেন্দু গুণ : অর্থাৎ একজন শিক্ষাবিদ ও লেখক হিসেবে আপনার কার্যক্রম সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন।

মুনীর চৌধুরী : প্রধানত তাই।

নির্মলেন্দু গুণ : আপনি তখন ছাত্র, ১৯৪৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ভাষা ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে যে প্রথম ছাত্রসভা হয় তাতে আপনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন– আপনার কি মনে আছে, আপনি কী বলেছিলেন সেখানে ?

মুনীর চৌধুরী : আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম ঘটনাটা। বদরউদ্দীন উমরেব 'পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি' পড়ে আমি সেটা জানলাম– কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও আমি ঠিক মনে করতে পারছি না, আমি হুবহু কিভাবে কী বলেছিলাম, তবে বক্তব্য নিশ্চয়ই 'ভাষা ও সংস্কৃতির স্বাধিকার দিতে হবে'— 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'— এই সবই ছিল। আমাদের বক্তব্য ছিল বাংলার পক্ষে লড়াই কবা প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্রের জন্যই লড়াই।

নির্মলেন্দু গুণ : এমন কোনো ঘটনার কথা কি আপনার মনে পড়ে যা একুশের স্মৃতি মনে এলেই— হোক আপনার খুবই ব্যক্তিগত তবুও— যা একটি নতুন তাৎপর্য বহন করে, যা কোথায় আলোচিত হয় নি, খুব ব্যক্তিগত হয়েও যা ব্যক্তিকে অতিক্রম করে যায় ?

মুনীর চৌধুরী : (কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন তিনি) তেমন কিছু মনে পড়ছে না ; শুধু মনে

পড়ছে, আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে সবেমাত্র শিক্ষকতায় ঢুকেছি— সাইকেলে চড়ে ক্লাস করতে যেতাম। এগারটার সময় ক্লাস করে বাসায় ফিরছি। সাইকেলে থাকা অবস্থাতেই টিয়ার গ্যাস-এর শব্দ আমার কানে আসছিল— আমি বাসায় না গিয়ে আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকেই ফিরে যেতে চাইলাম। কিন্তু পথে গিয়েই দেখলাম, সারা পথ ফাঁকা, থমথমে, ইপিআর-এর গাড়িগুলো যাচ্ছে-আসছে— বিশ্ববিদ্যালয় ভবন থেকে ইট-পাটকেল ছুঁড়ছে ছেলেরা। একেবারে গুলি চালানোর পূর্ব অবস্থা। একজন পুলিশ সার্জেন্ট আমাকে সাইকেল সমেত থামাল— 'ভাগো হিয়াসে'। আমি রেগে গিয়ে বলতে চাইলাম— আই এম এ 'ভার্সিটি টিচার। মূর্খ পুলিশের কানে সেটা অর্থহীন শোনাল। পেছন থেকে লাঠি দিয়ে আঘাত করল একজন পুলিশ— আমি মাটিতে পড়ে গিয়েছিলাম। আজকে সেই দিনের কথা মনে করেই আমার ড. জোহার কথা মনে পড়ছে। জোহা সেটা সহ্য করতে পারেননি— আর পারে নি বলেই জীবন দিয়ে তাঁকে চলে যেতে হলো। সাইকেলে উঠিয়ে পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে পুলিশ আমাকে ছেড়ে দিয়েছিল— আমি ভিসির কাছে গিয়ে নালিশ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু যাবার পথেই শুনলাম গুলির শব্দ। তার পর মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়লো ছাত্র-হত্যার সংবাদ, যার কাছে আমার নিজের সংবাদ মনে হচ্ছিল অর্থহীন।

[পুলিশের অত্যাচারের কথা শুনেই একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল হুমায়ুন, সে সঙ্গে সঙ্গেই ড. জোহার হত্যাকারীদের সমুচিত শাস্তি বিধানের দাবি জানানোর জন্যে মুনিব চৌধুরীর প্রতি আহ্বান জানাল এবং আমাকে এ তথ্যটি ভালোভাবে লিপিবদ্ধ করার অনুরোধ জানাল।]

নির্মলেন্দু গুণ : একুশের শহীদদের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করেও বলছি— আমার মনে হয়, আমাদের দেশে আসাদই প্রথম রাজনীতি সচেতন শহীদ। একুশে যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন তাঁদের কেউই রাজনীতি-সচেতন ছিলেন না— আপনি কি স্বীকার করেন, কিম্বা এঁদের মধ্যে কেউ রাজনীতি সচেতন ছিলেন বলে আপনার মনে পড়ে ?

মুনীব চৌধুরী : আমার তেমন মনে পড়ে না— তবে রাজনীতি সচেতন শহীদ বলতে আসাদকেই বোঝায়। এই প্রসঙ্গে তিনি শহীদ আবদুল মালেকের নামও উল্লেখ করেন এবং আক্ষেপ করে বলেন, একুশে ফেব্রুয়ারিতে আরো অনেক বেশি লোক শহীদ হয়েছে বলে আমার ধারণা। শহীদদের একটা প্রামাণিক দলিল তৈরি করা উচিত।

নির্মলেন্দু গুণ : যারা একুশের ভাষা আন্দোলনে হিন্দুদের হস্তক্ষেপ ও স্বার্থ আবিষ্কার করে আপনাদের বিরোধিতা করেছিলেন, আপনার কি ধারণা তারা আজও ধর্মের নামে বাংলা সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে বিকৃতি করার কাজে লিপ্ত রয়েছে ? এদের বিরুদ্ধে কি আপনি সচেতন ?

মুনীর চৌধুরী : নিশ্চয়ই আছে এবং আমি অনেকের মতো এদের বিরুদ্ধে সচেতন। যদিও আগের চেয়ে এদের কণ্ঠ খুবই ক্ষীণ তবুও সরকারি পর্যায়ে এরা অনেক বড় বড় পদ অলঙ্কৃত করে রয়েছে। সুতরাং এদের বিরুদ্ধে সচেতন থাকাটা সবারই উচিত।

নির্মলেন্দু গুণ : বাংলা একাডেমী তার সাহিত্য পুরস্কারের নাম 'একুশে ফেব্রুয়ারি সাহিত্য পুরস্কার' রাখা ঠিক করেছেন। আপনি কি এটাকে একটা শুভ পদক্ষেপ বলে

মনে করেন এবং আদমজী, দাউদ প্রভৃতি শিল্পপতিগোষ্ঠী পরিচালিত প্রদত্ত পুরস্কারের নাম পরিবর্তন করার বা এসব পুরস্কার বর্জন করার যে দাবি উচ্চারিত হচ্ছে, আপনি কি তা সমর্থন করেন ?

মুনীর চৌধুরী : হতে পারে এটা একটা শুভ পদক্ষেপ— কিন্তু বিরাট পদক্ষেপ বলে আমি মনে করি না। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, বাংলা উন্নয়ন বোর্ড গণসমর্থন অর্জন করার জন্য একুশের সংকলনকে পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে— রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়ক-গায়িকাদের ডেকে নিয়ে পুরস্কার দিয়েছেন।

নির্মলেন্দু গুণ : অর্থাৎ অনেক সময়ের সাথে সুর মিলিয়ে রঙ বদলাচ্ছে বলে আপনার ধারণা ?

মুনীর চৌধুরী : সে জন্যেই বলছিলাম— যে পর্যন্ত আমাদের সমাজজীবনে প্রচলিত ব্যবস্থাকে অস্বীকার করতে না পারছি, সে পর্যন্ত কোনো ব্যাপারেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে যাওয়া যায় না।

আদমজী, দাউদ পুরস্কার সম্পর্কে তিনি বলেন, সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ছাড়া এগুলো বর্জন করার খুব বেশি অর্থ হয় না। কেননা, নাম পরিবর্তনই বড় কথা নয়। তিনি স্বীকার করেন, আদমজী পুরস্কারে কোনো সময়ই সাহিত্যমূল্য রক্ষিত হয় নি— এতে লেখকের আর্থিক লাভ ছাড়া অন্য কিছুই হয় না।

এই পুরস্কার লাভে কোনোই গৌরব নেই। কোনো লেখক যদি পুরস্কার বর্জন করেন তিনি তাঁকে শ্রদ্ধা করবেন। এটা লেখকের জীবন-চেতনার উপর নির্ভর করে। রাজনৈতিক কর্মী না হলে যে-কোনো লেখকের যে-কোনো দেশীয় পুরস্কার গ্রহণেও তার আপত্তি নেই। তিনি কথা প্রসঙ্গে বলেন, আদমজী পুবস্কার চালু হবার প্রথম বৎসর আলাউদ্দীন আল-আজাদকে কবিতার জন্য পুবস্কার দেবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আলাউদ্দিন আল-আজাদ তখন জেলে—পুলিশ রিপোর্ট আজাদের বিরুদ্ধে থাকার জন্যে রাইটার্স গিল্ডের তৎকালীন কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত রশীদ করীমের মতো সাম্প্রদায়িক লেখককে আদমজী পুরস্কার দিয়ে দেন। রাজনৈতিক গোলমালের ভয়ে আমার 'কবরকে'ও আদমজী পুরস্কার দেয়া হয় নি। সুতরাং বলা চলে, আদমজী ইত্যাদি পুরস্কার গ্রহণে আর্থিক লাভ ছাড়া অন্য কোনো সম্মান নেই।

নির্মলেন্দু গুণ : প্রেস ট্রাস্টের অবলুপ্তির দাবিকে আপনি সমর্থন কবেন ?

মুনীর চৌধুরী : কোনো প্রতিষ্ঠানকেই প্রতিষ্ঠানগত দিক থেকে বিচার করা কঠিন– এমন কোনো প্রতিষ্ঠান নেই যাকে সম্পূর্ণভাবে ত্রুটিমুক্ত বলা চলে। এখানে পরিচালনার ভার নিয়ে প্রশ্ন। প্রেস ট্রাস্টের পত্রিকা বলেই আমি 'দৈনিক পাকিস্তানে'র নিন্দায় বিশ্বাসী নই।

নির্মলেন্দু গুণ : ট্রাস্টের কোনো কোনো পত্রিকা কি বাঙালি স্বার্থ ও সংস্কৃতি বিরোধী এবং সাম্প্রদায়িক ভূমিকা গ্রহণ করে নি ?

মুনীর চৌধুরী : স্বীকার করি— কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জনগণের মুখোশ পরিহিত অন্যান্য পত্রিকার কথাও ভাবতে হবে— এসব ভাবলে প্রেস ট্রাস্টকে কেবল একা দায়ী করা চলে না। ট্রাস্টভুক্ত নয় এমন একটা ইংরাজি দৈনিকের কথাও উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই

পত্রিকা বরাবর গণবিরোধী ভূমিকা নিয়েছে এবং এখনও গণবিরোধী কাজ করে যাচ্ছে।

নির্মলেন্দু গুণ : বাংলা ছাড়াই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় চালু করার নিন্দে করে ড. এনামুল হক যে বিবৃতি দিয়েছেন। তাঁর মতো আপনিও কি মনে করেন যে, এটা রূপান্তরিত সাম্প্রদায়িক ও সংস্কৃতি-বিরোধী একটি ষড়যন্ত্রের নামান্তর মাত্র ?

মুনীর চৌধুরী : আমি ড. এনামুল হকের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত এবং আমি জানি, এটা পূর্বপরিকল্পিত। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মুসলিম শব্দটিও খসবে এবং বাংলাও পূর্ণ উদ্যমে চালু হবে।

নির্মলেন্দু গুণ : সম্প্রতি কবি জসীমউদ্দিন সাহেব পত্রিকায় একটি বিবৃতির মাধ্যমে বিএনআর-কে সমর্থন করেছেন— অথচ জনমত এর অবলুপ্তির দাবি করছেন আপনার বক্তব্য কী ?

মুনীর চৌধুরী : এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক যে, জসীমউদ্‌দীন সাহেব অনেকদিন যাবত (হয়ত বার্ধক্যও একটা কারণ হতে পারে) এমন অনেক কাজ কবছেন যাকে কোনোক্রমেই শুভ ও স্বাস্থ্যকর বলা যায় না। এই বিবৃতিটি শুধু এই প্রমাণ করে যে, জসীমউদ্‌দীন সাহেব বিএনআর পরিচালককের স্তাবক দলভূক্ত। তাঁর বিবৃতিতে দেশের জনশ্রদ্ধ লেখকদেব হেয় প্রতিপন্ন করার যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তা নিন্দনীয়।

নির্মলেন্দু গুণ : এতো হলো জসীমউদ্‌দীন সাহেবের বিবৃতি সম্পর্কে অনেকের মতোই আপনারও বক্তব্য— কিন্তু বিএন আর সম্পর্কে আপনাব মতামত জানতে চাই।

মুনীর চৌধুরী : কোনো সংগঠনের প্রতিই আমার কোনো সংগঠনগত বিক্ষোভ নেই, যদি না সে সংগঠন গণবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপ চালিয়ে যায়। বিএনআর-এর বিরুদ্ধে অমার যা বক্তব্য তা হলো এর পবিচালনার ভার অধিকাংশ সময়ই অসৎ লোকদের হাতে ন্যস্ত ছিল—

নির্মলেন্দু গুণ : এবং এখনও আছে।

মুনীর চৌধুরী : হ্যাঁ, আমি বিএনআর-এর অবলুপ্তির কথাও বলি না— তাঁর পরিচালকের অপসারণের কথাও বলি না। আমার দাবি বিএনআর সরকারি অর্থ নিয়ে যে অপচয় এবং উদ্দেশ্যমূলক পক্ষপাতিত্বপূর্ণ কার্যকলাপ এতদিন চালিয়ে গেছে, তার একটা সুষ্ঠু হিসাব-নিকাশ ও বিহিত হওয়া প্রয়োজন।

নির্মলেন্দু গুণ : সাহিত্য-সংস্কৃতির নামে বিএনআর সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা এবং সাহিত্য পদবাচ্য নয় এমন অনেক লেখকের পুস্তক প্রকাশের নামে যে অযাচিত অর্থ বরাদ্দ করেছে— আপনি তার সম্পর্কে অবহিত আছে নিশ্চয়ই ?

মুনীর চৌধুরী : আমি জানি এবং জানি বলেই এর একটা তদন্ত অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে আমি মনে করি। আমি জানি এমন অখ্যাত অজ্ঞাত-লেখক আছেন যাদের রচনা বাজারে বিক্রি হয় না অথচ বিএনআর. সেসব পুস্তকের মধ্যে হঠাৎ করে ইসলামের আলো দেখতে পেয়ে বহু অর্থের বিনিময়ে পুনঃপ্রকাশে লেখককে সম্মানিত করেছে। তাই এর পরিকল্পিত গণবিরোধী ভূমিকা সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ।

নির্মলেন্দু গুণ : বাংলা একাডেমীব প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানের কথা আপনার মনে আছে কি ?

মুনীর চৌধুরী : হ্যাঁ, তখন যুক্তফ্রন্ট সরকার হয়েছে দেশে। আমি জেল থেকে সবেমাত্র বের হয়েছি অথচ আমি আমন্ত্রিত হইনি। আমি বাংলা একাডেমীর গেট পর্যন্ত গিয়েছিলাম, আশা ছিল, কেউ নিশ্চয়ই এগিয়ে এসে নিয়ে যাবে, কিন্তু কেউ আসে নি, আমি ফিরে এসেছিলাম।

আমরা সবাই তখন হেসে উঠেছিলাম, তিনিও যোগ দিলেন।

হুমায়ুন কবির : এটার পেছনে কোনো হীন উদ্দেশ্য ছিল বলে আপনি মনে কবেন— কিম্বা আপনি ছাড়াও আরো কেউ কেউ কি এরকম আমন্ত্রণ পাননি ?

মুনীর চৌধুরী : আমি সবার কথা জানি না। তবে আমি ছাড়াও শ্রীরণেশ দাশগুপ্ত এবং সরদার ফজলুল করিমও নিমন্ত্রণ পান নি বলে আমার মনে পড়ে।

আমাদের আলোচনা অনেক দীর্ঘায়িত হয়ে যাচ্ছিল। তিনি আমাকে অন্য আর একদিন আসার কথা বলছিলেন— তখন রাত অনেক হয়ে গেছে। আরো কিছু প্রশ্ন কবাব থাকলেও অগত্যা আমি শেষ প্রশ্ন করলাম তাঁকে।

নির্মলেন্দু গুণ : দেশে আকাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলশ্রুতিতে প্রতিবেশী পশ্চিম বাংলার সঙ্গে যদি সৎ সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাহলে মিলিতভাবে কোনো সাহিত্য সম্মেলন আহ্বানেব উগ্যোগ নেবার কথা চিন্তা করছেন কি ?

মুনীর চৌধুরী : এ ব্যাপারে এখন কোনো মন্তব্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে বাংলা ভাষাভাষী মানুষ হিসেবে— এই ভাষার উল্লেখযোগ্য লেখকদের প্রতি আমার সঙ্গত কারণেই শ্রদ্ধা অপরিসীম। তবে এ ধরনের কোনো সাহিত্য সম্মেলনের উদ্যোগ কেবলমাত্র রাজনৈতিক পরিবর্তনের পরেই সম্ভব। পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থার জন্যেই নয়—এর আগ থেকেও আমি যে দাবিটা জানিয়ে আসছিলাম, তা হলো দুই বঙ্গের রাজনৈতিক সম্পর্ক যাই থাকুক না কেন, তা যেন আমাদেব সাহিত্য সংস্কৃতিব বিকাশের অন্তরায় না হয়। বাংলাভাষায় লিখিত পুস্তক, চলচ্চিত্র, গান সবই আমাদের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের বিকাশে অপরিহার্য শব্দের আদান-প্রদানে রাজনীতি যেন আমাদেব অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। আর আমার মনে হয়, সৎ সম্পর্ক গড়ে ওঠলে উদ্যোক্তার অভাব হবে না

সাক্ষাৎকার (তিন)

প্রথমেই তিনি জানিয়ে দিলেন ভয়ানক ব্যস্ততার মাঝে তাঁর সময় কাটছে, ফলে খুব বেশি বলাটা তার পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠবে না। সম্প্রতি কী একটা জরুরি কাজে হাতে দিয়েছেন, যার ফলে প্রায়ই রাত তিনটে-চারটে এলোমেলো কাগজের ভীড়। তবু যখন বললাম, আপনার বহুল আলোচিত কবর নাটিকাটির রচনার পটভূমি জানতে এসেছি, তখন তাঁকে একটু উজ্জ্বল মনে হলো।

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলেন তিনি। তারপর ধীরে ধীরে স্মৃতি উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন। পেছনের ফেলে আসা দিনগুলোর মাঝে নীলক্ষেতের এই নিয়নজ্বলা বাড়িটা থেকে হারিয়ে যেতে চাইছিলেন তিনি। ১৯৫৩ সালেব ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে সেই উত্তপ্ত দিনগুলোতে ডিসেম্বর আর জানুয়ারিব শীতার্ত বাতগুলোতে যখন জেলের একটি কামবায বসে দারুণ এক অস্থিরতার শিকার হয়ে সমস্ত মন ঢেলে একটি ছোট খাতায় লিখছিলেন কবর নাটিকাটি। পরবর্তীকালে যা আলোড়ন তুলেছিল তুমুলভাবে। আজো যা সমানভাবে আলোচিত। বিষয়বস্তুর নির্বাচনে, আঙ্গিকের নতুনত্বে, দৃশ্যকল্প নির্মাণে, সব দিক থেকেই যা অভিনবত্বের স্বাক্ষর বহন করছে।

মুনীর চৌধুরী তখন জেলে। ভাষা আন্দোলনে গ্রেফতার হয়েছেন তিনি আরো অনেকেব সাথে। একসাথে পনেরো বিশজন রাজবন্দীর সাথে একটি কক্ষে থাকতেন। অপব একটি কক্ষে থাকতেন প্রায় ষাট-সত্তর জনের মতো বাজবন্দী। তাদের মাঝে বণেশ দাশগুপ্তও ছিলেন।

রণেশদাই গোপনে চিঠি লিখেছিলেন আমাকে। সামনে একুশে ফেব্রুয়াবি। একটা নাটক লিখে দিতে হবে। জেলখানাতে অভিনীত হবে। রণেশদার হুকুম। আমাকে লিখতেই হলো নাটক। সেটি কবর।

'জেলখানায় আপনার সাথে আর কারা ছিল ?'

'অনেকেই ছিল। আবুল হাশিম, মোজাফফর আহমদ, অলি আহাদ, মোহাম্মদ তোযাহা, অজিত গুহ, মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, খয়রাত হোসেন, শেখ মুজিবুব রহমান।' মুনীর চৌধুরী জানালেন জেলখানাতেই শেখ মুজিবুর রহমানেব সঙ্গে তাঁব অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে।

'জেলখানায় নাটক মঞ্চস্থ করার অসুবিধে ছিল না ?'

'ছিল, অবশ্যই ছিল। আর ঐ অসুবিধেটুকু সামনে ছিল বলেই তো কবর নাটকটিব আঙ্গিকে নতুনত্ব আনতে হয়েছে। সত্যি করে বলতে কি কবর নাটকটি একটি বিশেষ অবস্থার শিল্পগত রূপায়ণ।'

'কথাটা একটু ব্যাখ্যা করুন।'

'যেমন ধরো নাকটটিতে হ্যারিকেনেব ব্যবহাব রয়েছে যার আলো কবরখানাব

নির্জনতাকে ফুটিয়ে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। রণেশদা জনিয়ে দিয়েছিলেন রাত দশটার পর জেলখানার সমস্ত আলো নিভে যাবার পর তাঁদের কক্ষে নাকটটি মঞ্চস্থ করবেন তাঁরা। যেসব ছাত্রবন্দীরা রাতে হ্যারিকেন জ্বালিয়ে লেখাপড়া করত, তাদের ৮/১০টি হ্যারিকেন দিয়ে মঞ্চ সাজাতে হবে, সে কারণে অনেকটা বাধ্য হয়েই 'কবর' নাটকটিতে আলো-আঁধারির রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয়েছে।'

'নিশ্চয়ই। তা না হলে সেদিন এমন স্বার্থকভাবে জেলখানায় একটি কক্ষের আবছা আলোতে নাটকটা পরিবেশিত হতে পারত না। আর সে কারণেই আমি জেল থেকে এসে মঞ্চের অভাবের কথা বলি না।'

'আপনি কি বিদেশেও ছোট স্থানে নাটক হতে দেখেছেন ?'

'আলবত। শুনে অবাক হবে, বিদেশের অধিকাংশ নিরীক্ষাধর্মী নাটক ছোট ছোট ঘরে, অত্যন্ত সীমাবদ্ধ পরিবেশেব মাঝে, নিতান্তই ঘরোয়াভাবে দেখানো হয়। এতোটা ঘনিষ্ঠভাবে সেসব নাটক দেখার সুযোগ ঘটে যে অভিনয় চলাকালীন দর্শকদের সাথে অভিনেতা, অভিনেত্রীর মাঝে কোনোরকম ব্যবধান থাকে না বললেই চলে।'

এ ধরনের কোনো কোনো নাটকের কথা আপনার মনে আছে কি ?'

'আমি বছরখানেক আগে যখন পশ্চিম জার্মানিতে গিয়েছিলাম, তখন অনেক বাড়িতে এ ধরনের নাটক উপভোগ করেছি। 'দি রিহার্সাল' আর 'দি মেল ট্রেন স্টপস হেয়ার' নামের দুটি নাটক আমাকে যথেষ্ট মুগ্ধ করেছিল। আমার তো মনে হয় সত্যিকার জীবনধর্মী নাটকগুলো ওদেশে এখন বড় বড় থিয়েটারে নয়, ছোট ছোট ঘরের মাঝেই হচ্ছে। উত্তপ্ত তারুণ্যের সান্নিধ্যে হচ্ছে।'

'জেলে নাটকটি দেখতে পারিনি। কারণ আমি ছিলাম অন্য কক্ষে। শুনেছিলাম খুব ভালো হয়েছে। আমিও ব্যক্তিগতভাবে ওটাকে আমার এখন পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ রচনা, আবার সেই সাথে বিতর্কিত লেখাও বলতে পারি।'

'জেলখানাতে যখন আপনার কিছু দূরের একটা কক্ষে নাটকটি প্রথম অভিনীত হচ্ছিল, তখন আপনার মনে কোন্ ধরনের অনুভূতি হচ্ছিল ?'

'আমি নির্লিপ্ত ছিলাম। কেননা জেল এমন জায়গা যেখানে সমস্ত রকমের মানসিক উৎকণ্ঠাকে আয়ত্তে আনতে হয়। আর আমার নিজের লেখা সম্বন্ধে উৎকণ্ঠামূলক মনোভাব কখনো ছিল না।'

'কবর নাটকটি সম্পর্কে আপনার অভিমত কী ?'

'নিঃসন্দেহে এটি আমার দৃষ্টি উন্মোচনকারী শ্রেষ্ঠ লেখা।'

'প্রথম কোথায় নাটকটি ছাপা হয় ?'

'প্রায় সে সময়ই সেটা কপি হয়ে জেলের বাইরে চলে যায়। প্রথমে দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত হয়। তারপর হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত একুশের সংকলনে স্থান পায়। তবে এ নাটকটি সম্পর্কে পরবর্তীকালে একটি বিশেষ ধারণার জন্ম হয়েছে আমার। তা হলো আমার অবচেতন মন থেকেই বোধ করি একটি বিদেশী নাটকের প্রভাব ওতে পড়েছিল। অবশ্য এটা আমার অনেক পরে মনে হয়েছে।'

আবার স্মৃতিচারণায় ডুব দিলেন তিনি। খানিকক্ষণ চোখ বন্ধ করে রাখলেন। কপালেব ওপরে তার কাঁচাপাকা চুলগুলো লুটিয়ে পড়েছে। একটা হাত কপালের কাছে ধরা।

'সে ৪৩, ৪৪ সালের কথা। আমেরিকার বেশ কিছু বামপন্থী, প্রগতিশীল সৈনিকের সাথে আমার আলাপ হয়েছিল। তারা তখন কুর্মিটোলায় থাকতো। সে সময় তাদের কাছে থেকে বেশ কিছু বই পড়ার সুযোগ পাই। আর, আমেরিকার সাহিত্যের প্রতি, বিশেষ করে নাটকের প্রতি আমার কৌতূহল বাড়ে, ব্যাপক পঠনে তার সাথে অন্তরঙ্গ পরিচয়ও গড়ে ওঠে। যে সমস্ত সৈনিকেরা ছিল, তাদের প্রগতিশীল মন আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। কয়েকজনের সাথে রীতিমতো সখ্যতা জমে যায়। তাদের একজন এখন বিখ্যাত— ড. নরমান সিপ্রংগার।'

'আপনি বলছিলেন কবর নাটকে কোনো এক বিদেশী নাটকের প্রভাব রয়েছে।'

'ও হ্যাঁ, বেরী দ্য ডেড। সে সময়েই নাটকটি পড়ি আমি। তাতে মৃত ব্যক্তির প্রতিবাদ ছিল, সে যে কবরস্থ হতে চায় না, তার চিৎকার ছিল। এটুকই যা ভাবগত সাদৃশ্য কিছু থাকতে পারে। কিন্তু কবর যখন লিখি তখন এসব কথা আমার বিন্দুমাত্র মনে আসে নি। বেশ ক-বছর পা আমি অনেকটা অদ্ভুতভাবেই এই প্রভাবটি আবিষ্কাব করি। বোধ কবি সে সময় অবচেতন মনের প্রভাবটিই কাজ করবে।'

'আপনার কবর নাটকটি কি কোনো সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল ?'

'যথেষ্ট। অনেকেই বলেছিল এমন একটা ছমছমে রহস্যময় পবিবেশেব মাঝে মাঝে এমন কৌতুকময়তার আবহ কেন সৃষ্টি কবলাম। এ সম্পর্কে আমাব বক্তব্য হচ্ছে ভয়াবহতাব মাঝে আমি সব সময় কোনো না কোনো উৎকট তৃপ্তি খুঁজে পেয়েছি। কোনো বিষাদময় ঘটনা হলে তার উৎকট দিকটাকেই আমি বড় করে দেখেছি বা বলতে পার দেখতে চেয়েছি। এটি আমার আজীবনের বোধ। যেমন কবর নাটকে নেতার অঙ্গভঙ্গি যথেষ্ট কৌতুকময়, তার পেছনেও সেই একই ধারণা কাজ করছে।'

'শুধুমাত্র কি তাই ? আর কোনো বিশ্বাস দ্বারা আপনি চালিত হননি ?'

'দ্যাখো, আমি মুসলিম নেতৃবৃন্দকে অত্যন্ত কাছ থেকে দেখাব আব জানার সুযোগ হয়েছে আমার। ফলে তাঁদের ঘনিষ্ঠ আলোকে দেখে বিচার করে তাঁদের চরিত্রের অসারতার দিকটাই আমার কাছে বড় হয়ে দেখা গিয়েছে। তাঁদের বিভিন্ন কার্যাবলীর হাস্যময় দিকগুলো আমার সামনে প্রকট হয়ে উঠেছে। ফলে তার প্রভাবও পড়েছে হয়তো আমার লেখায়। নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের রোষ যেমন অনাবিল, ক্রোধও তেমনি সুতীব্র। কিন্তু অন্যভাবে তাঁদের দেখার দরুন নেতৃবৃন্দের চরিত্রের ঠুনকো দিকটাই আমার কাছে প্রাধান্য পেয়েছে।'

মুনীর চৌধুরী জানালেন, এ পর্যন্ত তাঁর কবব নাটকের কোনো ভালো দৃশ্যরূপ দেখেন নি তিনি। তার কারণ এদেশের নাট্যশিল্পের অপরিচ্ছন্ন প্রোডাকশন তাঁকে যথেষ্ট পীড়িত করে।

'জানো, সে কারণে আমি আমার নিজের নাটকও দেখতে খুব একটা উৎসাহবোধ করি না, বলতে গেলে যাই-ই না। এই তো কিছুদিন আগে আমাব নাটক করল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা। একটি দোষ দেখলাম, পার্ট কেউ ভালো মুখস্থ করে নি

সত্যি, এসব আমাকে খুব ক্ষুব্ধ করে তোলে।'

আমি মুনীর চৌধুরীকে কোনদিন উত্তেজিত হতে দেখিনি। এবারও দেখলাম না। কেমন নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে তাঁর সেই বিশেষ ঢঙটিতে তিনি কথা বলে গেলেন। কিন্তু তাঁর একটি মৃদু অভিযোগ ছিল।

'শুধুমাত্র কবর নাটকটিতে একুশের তাৎপর্য খোঁজা হলে খানিকটা ভুলই বরং করা হবে। হয়তো আরো বেশি কিছু বলার চেষ্টা করেছি আমি। আরো বেশি কিছু।' একটু থেমে বললেন মুনীব চৌধুরী।

'আপনার কবর নাটক সম্পর্কে তো অনেক মন্তব্যই করা হয়েছে। তার মাঝে কোনটি আপনার মনে সবচেয়ে বেশি দাগ করেছে?'

'তা বটে। প্রচুর মন্তব্য কানে এসেছে। অনেক সমালোচনাও তার পড়েছি। কিন্তু যে খাতায় আমি প্রথম কবর নাটকটি লিখেছিলুম। সেটি ফেরত পাঠাবার সময় রণেশদা একটি মন্তব্য লিখেছিলেন, আজো তা আমার মনে জ্বলজ্বল করছে।

রণেশদা বলতে চেয়েছিলেন আমার মাঝে যদি সুস্পষ্ট রাজনৈতিক প্রত্যয় থাকতো বা কোনরকম সংশয় বা দ্বন্দ্বের মাঝে আমি না থাকতাম তবে হয়তো আমার নাটকটির শেষ অন্যরকম হতো।'

'আপনার মনে কি রণেশ দাশগুপ্তের মন্তব্যটি আলোড়ন তুলেছিল?'

'অনেকটা। রণেশদা আমার সম্পর্কে লিখেছিলেন লেখক কি বরাবরই এই অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকবেন? সত্য কি সামনে নেই? এভাবে নাটক শেষ হতো না যদি তিনি সংশয়ী না থাকতেন। এখন আমার সম্পর্কে অনেকে বলে থাকেন, আমি যদি পুরোপুরিভাবে রাজনীতির সাথে জড়িত থাকতাম, তবে আমারও মঙ্গল হতো, সেই সাথে দেশেরও।'

'গণনাটক সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?'

'যতক্ষণ সমাজ শ্রেণীবিভক্ত আছে লেখার আবেদনও বিভিন্ন ধরনের হবে। সর্বস্তবেব লোক একই সাথে কোনো শিল্পরস সাধারণত উপভোগ করতে পারে না।'

'আপনার নাটক বুদ্ধিদীপ্ত, আপনার সংলাপ কৌশলী ভাষণ, সাধাবণ লোক নিশ্চয়ই তা ঠিক বুঝে উঠতে পারবে না?'

'আমি নগরবাসী, উচ্চশিক্ষিত লোকদের ছাড়া আর কারো জন্য লিখতে পারছি না। কেননা নিচু জীবনের আত্মত্যাগ সম্পর্কে আমার তেমন স্বচ্ছ ধারণা নেই। আসলে লেখাতে তাদের মর্মগত শিল্পবেদনা ফুটিয়ে তুলতে হবে। শ্রমিকদের স্বেদ মেটাতে হবে। জীবনের মহিমা আর বেঁচে থাকার মহিমা বুঝতে হবে। কৃত্রিমতাব আশ্রয়ে ওসব লেখা যায় না। যেতে পারে না।'

সাক্ষাৎকার (চার)

দেশেব সবখানে যেমন বাংলা ভাষা অবহেলিত তেমনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েব বাংলা বিভাগ সবচেযে অবহেলিত বিভাগ। বাংলা বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয়েব প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

১৯৫৪ সালে ভাষা আন্দোলনে কাবাভোগী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযেব বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক প্রফেসর মুনীর চৌধুরী এক বিশেষ সাক্ষাৎকাবে এ মন্তব্য কবেন।

তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়েব সবচেয়ে অবহেলিত বিভাগ হচ্ছে বাংলা বিভাগ। অন্যান্য বিভাগ যে সব সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে বাংলা বিভাগ তাব প্রাপ্য অনেক সুবিধা থেকে বঞ্চিত। বিভাগের ছাত্রের তুলনায় এখনও নয়জন শিক্ষকেব অভাব বযেছে।

বর্তমান পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বাংলা ভাষার সার্বিক প্রসাবে কী করণীয হতে পাবে এই সম্পর্কে তাঁর মত জানতে চাইলে অধ্যাপক মুনীব চৌধুবী বলেন, আমি মনে কবি বাংলা ভাষা প্রচলনের যে সমস্যা তা বাংলা ভাষা উন্নযনেব সাথে সম্পর্কিত নয। এটা প্রধানত দেশেব বাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সম্পর্কেব উপর নির্ভর কবে। তিনি বলেন, যারাই বাংলা ভাষাব প্রসার ঠেকিয়ে রাখতে চেয়েছে তাবাই আবাব বাংলা ভাষাব সর্বস্তরে প্রচলন উচ্চকণ্ঠে দেখা গিয়েছে। এই ধরনের কাজ বহুকাল ধরে চলেছে এবং চলবে। বাংলা ভাষার সরকারি স্বীকৃতি এসেছে ছাত্র তথা আপামর জনসাধারণের চাপে পড়ে। স্বীকৃতিই শুধু পাওয়া গেছে। কার্যকালে এর ব্যবহাব আব কেউ কবেনি। তিনি বলেন বাংলা ভাষাব শত্রু বাইবের কেউ নয়, বাংলা ভাষাব শত্রু বাঙালি আমলা ও পণ্ডিতরা। মুনীর চৌধুরী বলেন, শত্রু দুই ধরনের বযেছে। এক, বাজনৈতিক বিরোধী শক্তি। দুই, সাধারণভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতরা। অধ্যাপক মুনীর চৌধুবীর মতে শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলা প্রচলনের ক্ষেত্রে বাধা বিশ্ববিদ্যালয়েব পণ্ডিতবাই। তিনি বলেন— বাংলা ভাষা বিরোধিতার অন্যতম দুর্গ হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়। পণ্ডিতবর্গ বাংলা ভাষার প্রকাশ্য বিরোধিতা করেন না বটে তবে টেকনিক্যাল কুযুক্তি দেখান। মুনীর চৌধুরী বলেন বাংলার প্রচলনটাকে বিলম্বিত করার জন্যেই যত প্রকার পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রয়াস উদ্ভাবন করা হয়েছে।

এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, কয়েকদিন আগে শেখ মুজিবের ঘোষণার পরে বাংলার প্রচলনটা অনেকাংশে সহজ হয়ে আসতে পারে। তাঁর মতে রাষ্ট্রশক্তি যদি মনে করে জনমতকে শ্রদ্ধা করতে হবে তাহলে একটা সমস্যা চুকে যায়। তবে মূল সমস্যার কোনো সমাধান হবে না। তিনি বলেন এ্যাদ্দিন পর্যন্ত বাংলা ভাষার উন্নয়নের শুধু কথাই প্রচার করা হয়েছে।

দেশে নতুন গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা হলে সর্বস্তরে বাংলা প্রচলনে কী সুবিধা আশা করা যায়— এই প্রশ্নের উত্তরে মুনীর চৌধুরী বলেন : গণতান্ত্রিক সরকার হুকুম দিলেই কাজটা অনেকাংশে সহজ হয়ে পড়ে। হুকুম পেলে বাকিটা করা অসুবিধাজনক হবে না বলে তিনি মনে করেন।

সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের আদেশ জারি হলে একাডেমিক পর্যায়ে কী করা যাবে জানতে চাইলে তিনি বলেন, উচ্চপর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা প্রচলনের উদ্যোগ হলে বাংলা বিভাগ উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এই প্রসঙ্গে তিনি বিএ পাস কোর্সে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩০০ নম্বর বাধ্যতামূলক করার উপর পুনর্বার জোর দেন। উল্লেখযোগ্য যে, একমাত্র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএ পাস কোর্সে তিনশো নম্বর বাংলায় বাধ্যতামূলক। অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী বলেন, এই পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র বাংলা ভাষায় হতে হবে এবং তিনি বলেন, যদি আমরা সবাই মনে করি, বাংলা আমাব সকল কাজের বাহন তাহলে সকল অনার্স কোর্সে একশো নম্বর বাংলা বাধ্যতামূলক করা উচিত। কারণ দেখা গেছে অন্যান্য বিষয়ে খুবই ভালো রেজাল্ট করে জীবনক্ষেত্রে আসেন যাদের অনেকেই ভালো বাংলা বলতে পর্যন্ত পারেন না। জানা তো দূরের কথা। বাংলাতেই যেহেতু আমাদের জীবনের সবকিছু নিয়ন্ত্রিত সেহেতু অনার্স বিষয়ের সাথে একশো নম্বর বাংলা ভাষাটা আয়ত্ত করা অসুবিধের কিছু নয়। বিদেশের প্রত্যেক জায়গাতেই মাতৃভাষার মাধ্যমে জ্ঞান দান করা হয়। একমাত্র আমাদের দেশেই বোধ হয় নিয়ম আছে যে মাতৃভাষাচর্চা ছাড়াও বিরাট পণ্ডিত হয়ে যেতে পারেন। অন্যান্য বিষয়ে যাঁরা অনার্স পড়েন তাঁদেব অনেকের দেখা যায় ইন্টারমেডিয়েট পর্যায়ের পরে বাংলা ভাষা তাঁদের আয়ত্তের বাইরে। এটা হওয়া উচিত নয়। সকলেরই মাতৃভাষার প্রতি অনুগত থাকা উচিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা একশ' নম্বর বাধ্যতামূলক করা প্রসঙ্গে অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী বললেন, জানি, বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতমহল এটা সহজে হতে দেবে না। এটা ইতিমধ্যেই পদে পদে আমি টের পেয়েছি। বাংলা ভাষা সকলের কমবেশি জানতে হবে এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতমহল বিশ্বাস করেন না। তিনি বলেন, তাঁরা এই ব্যাপারে অনবরত কুযুক্তি তোলেন। বলা হয়ে থাকে, বাংলা বাধ্যতামূলক করা হলে একটা বিষয় কম পড়ে যাবে। আরো বলা হয়, বিদেশে ইংরেজি বাধ্যতামূলক নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে আগে ইংরেজি বলার উপর মৌখিক পরীক্ষা হতো। এখন আর বাংলায় বলতে পারাটা দেখা হয় না।

মুনীর চৌধুরী বিষয় নির্বিশেষে বাংলাকে সকলের আয়ত্ত করতে হবে বলে দৃঢ় মত প্রকাশ করেন।

প্রশ্ন করা হলো, শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলা ভাষা চালু হয়ে গেলে যারা বাংলায় পড়াতে অভ্যস্ত তাদের কি অসুবিধা হবে না? মুনীর চৌধুরী এই প্রশ্নের জবাবে বললেন, বিষয় সম্পর্কে যাঁর উপলব্ধি পরিণত হয়েছে তার বাংলায় বক্তৃতা দিতে না পারার কোনো কারণ নেই। তিনি মনে করেন, বিষয়কে যিনি আত্মস্থ করতে পেরেছেন তাঁর পক্ষে মাতৃভাষায় সেটা প্রকাশ করাটাইতো সবচেয়ে সহজ কাজ। তিনি বলেন, আর যাঁরা তার পরেও পারবেন না তাঁদের জন্যে সংক্ষিপ্ত বাংলা শিক্ষাকোর্সের ব্যবস্থা যাবে।

শিক্ষার মাধ্যম যদি বাংলা হয় তাহলে আমাদের যে রূপান্তরিত পাঠ্যপুস্তকের সমস্যাকে সামলাতে হবে এর পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর মত জানতে চাইলে তিনি বলেন, পাঠ্যপুস্তক বা পরিভাষা যাই বলি না কেন এর পেছনে প্রথম প্রয়োজন সদিচ্ছা এবং উদ্যোগ। তিনি বলেন, যদি আমাদের দেশের সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ

আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন বাংলা ভাষায় পাঠ্যবইয়ের প্রয়োজন তাহলে পাঠ্যবই এ্যাদ্দিনে প্রচুর বেরিয়ে যেত। তিনি বলেন, আমাদের দেশে প্রকাশক আছে প্রচুর। তারা পর্যাপ্ত পাঠক পেলে বই বের করবে না কেন? যখন বাংলা ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হয়ে যাবে, তখন বাংলা ভাষায় পাঠ্যবই কেনার লোকও বেড়ে যাবে। তখন বাংলায় বই বেরুবে। পাঠ্যপুস্তকটা কোনো সমস্যাই নয়। সমস্যা অন্যখানে। সমস্যা হলো আমাদের চরিত্রের। বাংলার মাধ্যমে পড়বার এবং পড়াবার মনোভঙ্গি গড়ে তুলতে হবে আমাদের সর্বাগ্রে।

মুনীর চৌধুরীর মতে পাঠ্যপুস্তক লিখবার জন্যে পণ্ডিত ব্যক্তির প্রয়োজন হয় না। তিনি বলেন সাধারণত দেখা যায় বড় বড় সরকারি প্রতিষ্ঠান পদাধিকার বলে পণ্ডিতদের বই রচনা করতে দেন। সেই বই আর শেষ পর্যন্ত বেরোয় না। মুনীর চৌধুরী বলেন পাঠ্যবই রচনার জন্যে মাঝারি প্রতিভার ছাত্ররাই যথেষ্ট। পাঠ্যবই যে মানের হয়ে থাকে তা কোনো বিশেষ মৌলিক প্রতিভার প্রয়োজন হয় না। তিনি পাঠ্যবই সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই অনুবাদ সংস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, অনুবাদ সংস্থার মাধ্যমে পাঠ্যবইয়ের ভাষান্তর অনেক সময় সহজ ও দ্রুত হয়ে যাবে।

এক প্রশ্নের জবাবে মুনীর চৌধুরী বললেন, শুধু বাংলার ছাত্ররাই নয়, প্রায় সব বিভাগের ছাত্ররাই আজ শিক্ষাজীবন শেষে চাকুরির নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত। তবুও যারা বাংলায় এমএ পাস করে বেরোয় তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর মত জানতে চাইলে তিনি বললেন, বাংলা ভাষা যদি জীবনের সর্বস্তরে প্রচলিত হয়ে যায় তখন বাংলার বহু লোকের কাজের প্রয়োজন হবে। তখন কাজের অন্ত থাকবে না। অনুবাদ বিভাগে বাংলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীরাই জায়গা করে নেবে। তিনি বলেন, এসবে পণ্ডিতের ভাষার দরকার হয় না।

সাক্ষাৎকারের শেষ পর্যায়ে যখন উঠে আসছিলাম, তখন এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সবচেয়ে অবহেলিত বিভাগ। এই বিভাগ তার ন্যায্য প্রাপ্য থেকে পর্যন্ত বঞ্চিত। এখনো এই বিভাগের নয়জন শিক্ষকের অভাব রয়েছে।

বাংলা ভাষা প্রসারে ও শিক্ষাদানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ভূমিকা কারো অজানা নয়। আগামী জুন মাসে বাংলা বিভাগ অর্ধশত বার্ষিকী পালন করতে যাচ্ছে। পঞ্চাশ বছর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরেও বাংলা ভাষা আন্দোলনের উনিশ বছর পরে আজ একাত্তরের শহীদ স্মরণের বেদীমূলে দাঁড়িয়ে বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ মুনীর চৌধুরী সখেদে যে কথা বলেছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত ছাত্রছাত্রীরা জানতে ইচ্ছুক।

অধ্যাপক চৌধুরী বিএ পাস কোর্সে বাধ্যতামূলক ইংরেজি তুলে দেয়ার দাবি জানান।

তিনি বাংলা সাহিত্যের ও ভাষার গবেষণার জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের দাবি জানান। তিনি পূর্ববাংলার ভাষা জরিপ প্রকল্প চালুর জন্যেও দাবি জানান।

কথিকা : ওয়াশিংটন থেকে

আমেরিকার কর্মপটুতা ও ঐশ্বর্যের মহানগরীর প্রতীক নিউইয়র্ক। কিন্তু তার আন্তরশক্তির শৃঙ্খলা, সুষমা ও পরিণতি অনায়াসে উপলব্ধি করতে হলে ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়ার ওয়াশিংটন শহরে, সংক্ষেপে ওয়াশিংটন ডিসি বেড়াতে যেতে হবে। এ শহর নিউইয়র্কের মতো জমকালো নয়। নিউইয়র্কের অবিশ্রান্ত কোলাহল, অপরিমেয় জনবহুলতা, উচ্ছ্বসিত নৈশজীবনের বর্ণাঢ্য রোমাঞ্চকরতা, কোনো অর্থেই ওয়াশিংটন ডিসির কর্মরত কিন্তু মর্যাদাবান, প্রশান্ত জীবনপ্রবাহের সঙ্গে তুলনীয় নয়। এই এলাকায় কলকারখানা স্থাপন পর্যন্ত আইনত নিষিদ্ধ। তাই ওয়াশিংটন ডিসির আকাশ বাতাস কয়লার ধোঁয়া কি চিম্‌নির কালিতে কলুষিত নয়। ওয়াশিংটন ডিসিতে আছে মহানগরের মহিমা, তার আধুনিক উপকরণের সমারোহ, নাই তার অপরিচ্ছন্নতা, তার ব্যস্তরুষ্ট শ্বাসরোধকারী আবহাওয়া।

ওয়াশিংটন ডিসির মানুষও অন্য কোনো শহরের মতো নয়। স্থায়ীর চেয়ে অস্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যাই বেশি। আমেরিকার সকল অঞ্চল থেকে মানুষ এসে এখানে জড় হয়, নানা সরকারি দফ্‌তরের কর্মচারী হয়ে। দেশ-বিদেশের কেতাদুরস্ত নরনারীতে পরিপূর্ণ এই শহর, সব দূতাবাসের কণ্ঠলগ্ন হয়ে নগরশোভা বর্ধন করে। আর সেই সঙ্গে বিশেষ বিশেষ মৌসুমে নিজেদের গোটা মুল্লুকের এবং সারা বিশ্বের ভ্রমণকারীরা আচ্ছন্ন করে ফেলে ওয়াশিংটন ডিসি। স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা আসে গাড়ি গাড়ি, দেশের ইতিহাসের স্মরণচিহ্নসমূহ স্বচক্ষে দেখে যেতে, রাষ্ট্রীয় পরিচালনার কেন্দ্রীয় শক্তির কর্মপ্রণালী সরজমিনে তদারক করে বুঝে নিতে। এক একটা শহরের চরিত্র তার পথঘাটের জনস্রোতের প্রকৃতিতে ধরা পড়ে। কোন বয়সের কারা কোন্ পোশাকে কখন কোথায় কী কারণে ভীড় করে, তার মধ্যেই রয়েছে শহরের আত্মপরিচয়ের স্বাক্ষর। ওয়াশিংটনের ভীড় দুপুরে আর সকালে। যখন অফিস শুরু হয় এবং যখন শেষ হয়। ভোরবেলাকার ওয়াশিংটন অর্ধঘুমন্ত, সন্ধ্যায় পরিশ্রান্ত। যারা ভিড় পরিপুষ্ট করে তারা অন্যান্য অনেক শিল্পোন্নত মহানগরের পোশাক-পরিচ্ছদে উদাসীন এলোমেলো জনতার মতো নয়। পুরুষদের পরনে তিন প্রস্থের স্যুট, জুতোয় আয়নার পালিশ। আর অগণিত মহিলা। কিশোরী, তন্বী, প্রৌঢ়া। সুঠাম, সুবেশী, সুস্মিতা। আফিসে আফিসে চাকরি করে। সেখানে সুপ্রসন্ন সৌজন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রদর্শনের ক্ষমতাই কর্মদক্ষতা প্রকাশের অন্যতম অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়। প্রাক-দুপুরে এই মিছিল প্রবেশ করে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় দফ্‌তরের অতিকায় অট্টালিকাসমূহে, স্তব্ধতা নামে নগরে। অপরাহ্নে চঞ্চলতা জাগে আবার যখন এই জনতাই গৃহমুখী হয়। গোটান নগরের প্রায় অর্ধেক অধিবাসী এই শ্রেণীর, বাকি অর্ধেক নিযুক্ত রয়েছে এদের জীবনযাত্রার উপকরণ সরবরাহ করার কাছে। ওয়াশিংটন সাদা-কালোর বিরোধ থেকে মুক্ত। অফিসের কর্মচারীদের মধ্যে এক-

চতুর্থাংশ নিগ্রো, স্কুলে ছাত্রশিক্ষক উভয়েব মধ্যেই তাঁরা সাংখ্যায় অধিক।

আর আছে ওয়াশিংটনের ট্যুরিস্ট। আমরাও যাঁদেব চোখে এই নগর দর্শনেব অভিলাষী। পৃথিবীর প্রায় সব বড় বড় শহরের প্রাণ তার বক্ষস্থিত নদী। লন্ডনের টেইমস, প্যারিসের সিন, মস্কোব মস্কোয়া, ওয়াশিংটনের পোটোম্যাক। এই নদীব তীরে, পোটাম্যাকের অন্যান্য শাখা ও ঝিল বেষ্টিত ভূখণ্ডে ওয়াশিংটন মহানগর প্রতিষ্ঠিত। এ শহব আপনা-আপনি গড়ে ওঠে নি। পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী একে তৈরি করা হয়েছে। কৃত্রিমভাবে গঠিত বলেই এ শহর এত সুগঠিত। বাষ্ট্রপ্রধানেব প্রাসাদ, বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় দফতর, লাইব্রেরি, যাদুঘর, নানা ধর্মমাতার উপাসনাগার, স্মৃতিসৌধ, তাদের পরিবেষ্টিত করে রাজপথের বায়ুমণ্ডলী, সবই সুপরিকল্পিত আদর্শ অনুযায়ী বিপুল শ্রম ও অর্থব্যয়ে নির্মিত। জগদ্বিখ্যাত স্থপতিরা এর পরিকল্পনা প্রস্তুত করে পৃথিবী ঢুঁড়ে সেরা মালমসলা জড় করে দক্ষ কারিগররা তাকে বাস্তবে রূপায়িত করেন। বিদেশীব কাছে ওয়াশিংটন ডিসির আসল আকর্ষণ তাব নগর-পবিকল্পনাব সৌকর্য, তাব অজস্র প্রশস্ত বীথি। তাব গগন ঢাকা স্মৃতিসৌধসমূহ।

সবটা ওয়াশিংটন যদি এক নজরে জবিপ কবাব ইচ্ছে থাকে তবে হেলিকপটারে চড়ে আকাশে উড়তে হবে। যদি চার নজবে দেখলে চলে তবে নগবকেন্দ্রের উচ্চতম স্মৃতিমিনার ওয়াশিংটন মনুমেন্টের চূড়ায় উঠতে হবে। কারুকার্যহীন শুভ্র মসৃণ চৌকো স্মৃতিস্তম্ভটি বাঁশফলকের মতো খাড়া আকাশমুখী উড়ে গেছে, মলের ওপব পাঁচশ পঞ্চান্ন ফুট। পাঁচশ ফুট পর্যন্ত সিঁড়ি আছে, তাব আটশ আটানব্বইটি ধাপ। যদি শারীরিক কারণে অত সিঁড়ি ভাঙ্গার অভিজ্ঞতা লাভের লোভ সংববণ করতে হয়, তাহলে লিফট ত রয়েছেই। শূন্যে উঠে-যেতে যেতে যন্ত্রে প্রচারিত স্তম্ভেব ইতিহাস আগাগোড়া শুনে নিতে পারবেন। উপরে উঠে এলে দেখবেন, চাবপাশেব চার দেয়ালে দুটো কবে মোট আটটা জানালা। একেক জানালা দিয়ে একেক দিকে উঁকি দিলে চোখ প্রসারিত করে দিতে হয় এক একটি দিগন্তস্পর্শী পথ ধবে, যার শেষ প্রান্তে পৌছে দৃষ্টি বিদ্ধ হয় কোনো ঐতিহাসিক ইমারতে বা স্মৃতিসৌধে।

সবুজ ঘাসেব গালিচা বিছানো এক মাইল দীর্ঘ সুবক্ষিত ভূখণ্ডেব অপর প্রান্তে ক্যাপিটল বা রাষ্ট্রীয় আইন পরিষদ ভবন। প্রাচীন স্থাপত্যবীতিতে গঠিত, প্রকাণ্ড গম্বুজ শোভিত প্রাসাদোপম শুভ্র অট্টালিকা। গম্বুজেব চূড়ায়, ব্রোঞ্জেব তৈরি স্বাধীনতার প্রতীক মূর্তিটিও সামান্য নয়, সাড়ে উনিশ ফুট দীর্ঘ। তৈবি কবা শেষ হয় এক শত বৎসরেবও পূর্বে। অন্য জানালা দিয়ে দৃষ্টি মেলে দিলে নজরে পড়বে, যার নামই হোয়াইট হাউস, রাষ্ট্রপতির ভবন। বর্ণ শুভ্র। এইখানেই ওয়াশিংটন ডিসির বিশিষ্ট আভিজাত্য। তার অভ্যাস প্রাচীন, রুচি বনেদি। স্থাপত্যরীতিতে সে সর্বত্র আধুনিক উপকাবিতামূলক লঘুতাকে, সরলীকরণকে সচেতনভাবে এড়িয়ে গেছে। প্রয়োজন হলে ইমারতেব অভ্যন্তরে হালের প্রয়োজন অনুযায়ী আধুনিক সুবিধাদির ব্যবস্থাদি প্রবর্তিত করেছে অধিক। হোয়াইট হাউসে নির্দিষ্ট সময়ে ছাত্রছাত্রী এবং পর্যটকরা এসে, প্রাসাদের অভ্যন্তরে ঘুরে ফিরে দেখে রাষ্ট্রের বর্তমান ও অতীত প্রেসিডেন্ট কোন্ গৃহে বাস করেছেন, কোন টেবিলে বসে কাজ করেছেন, কোন অলিন্দে চিন্তামগ্ন চিত্তে পায়চারি করেছেন। অন্য জানালায় এসে দাঁড়ালে

দূরে দেখা যায় জেফারসনের স্মৃতিসৌধ। সম্ভবত ওয়াশিংটন শহরের এটাই সর্বাপেক্ষা মর্মস্পর্শী রূপময় দর্শনীয় স্থান। সামনে ঝিল, সেতু বেয়ে পার হলে স্মৃতিসৌধে পৌছান যায়। সম্মুখের জলবিস্তারের প্রান্ত ঘিরে সারি সারি গোলাপি চেরি ফুলের হিল্লোলিত শাখা। অশ্রুর বুদবুদ-এর মতো স্তম্ভোপরি শ্বেতমর্মরের গম্বুজে গঠিত স্মৃতিসৌধ আমাদেরও অশ্রুভারাক্রান্ত করে তোলে। ভেতরে জেফারসনের বিরাট ব্রোঞ্জের মূর্তি। চারপাশের দেয়ালের গায়ে খোদাই করা জেফারসনের অমর বাণী : I have sworn upon the altar of God eternal hostility to every form of tyranny over the mind of man.

কিম্বা স্বাধীনতা সনদের ঘোষণা : We hold these truths to be self evident that all men ae created equal, that they are endowed by their creator certain inalienable rights, that among these are life, liberty and the persuit of happiness.

ওয়াশিংটন মনুমেন্টের একদিকে ক্যাপিটেল, অন্যদিকে লিংকনের স্মৃতিসৌধ, জানালা দিয়ে দূরে দেখা যায়। গ্রিক স্থাপত্যরীতির জটিলতাহীন গঠন, স্তম্ভের ওপর কৌণিক মর্মরের আচ্ছাদন। ভেতরে শ্বেতমর্মরেরই উপবিষ্ট লিংকনের চিন্তামগ্ন বিষণ্ন মূর্তি। দেয়ালে খোদাই করা তাঁরই অবিস্মরণীয় বাণী : মানুষের মুক্তির, সাম্যের স্বাধীনতার।

সব দেখা শেষ হলে একবার ম্যাসাচুসেটস এভিনিউতে আসবেন। রক ক্রিক পার্কের সঙ্গেই যেখানে এমব্যাসি রো ঝলমল করছে। ১৯৫৭ সালে এখানে এক অপরূপ মসজিদ নির্মিত হয়েছে, মিশরীয় গোলাপি মর্মরে। পনেরটি মুসলিম রাষ্ট্র এর নির্মাণে সহযোগিতা করেছে। যেমন শোভায় তেমনি গুরুত্বে, এই মসজিদ মার্কিন মুলুকে বিশ্ব মুসলিম সংস্কৃতির এক মর্যাদাবান প্রতীক।